পঞ্চম অধ্যায়

মুসলিম সমাজের ধর্মকেন্দ্রিকতা ও বাংলা উপন্যাসের বিনির্মাণবাদী পাঠ

নারীকে কখনোই পূর্ণ মানুষ বলে স্বীকার করেনি এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজ । জন্মের পর থেকেই শুরু হয় তাদের ধমকানো, মারধোর এবং অত্যাচার ক্রমপর্যায়ে বাবা, স্বামী ও ছেলের হাতে । এসবের মধ্য দিয়ে পুরুষতন্ত্র নারীদের পরিসর নিজেদের সুবিধার্থে নিজেদের মতো করে তৈরি করে দেয় । নারী কখন কী করবে, কীভাবে কথা বলবে, কখন কাঁদবে, কখন হাসবে, কীভাবে হাসবে প্রত্যেকটা মুহূর্তের কার্যকলাপ পুরুষ ঠিক করে দেয় এবং ইচ্ছেমতো ব্যবহার করে তাকে । সমালোচকের মতে --

> *"অনন্ত পিতৃতন্ত্রের নিশ্ছিদ্র অচলায়তন থেকে নারীর নিজেস্ব পরিসর খুঁজে নেওয়ার নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রামের ইতিহাস এই রকম উচ্চাবতো আর অরৈখিকতাই তার অভিজ্ঞান । পুরুষদের দ্বারা যথেচ্ছ ব্যবহার্য যৌনপুতুল ও ক্রীতদাসী হিসেবে নিজের পরিসর শূন্যতায় অভ্যস্ত ছিল নারী । .....নারীর ভালোমন্দ, উচিৎ-অনুচিত সমস্তই নির্ধারণ করেছে পিতৃতন্ত্র ।"* (১)

অর্থাৎ নারীর শরীরও ও তার নিজস্ব নয় । এই শরীর নিয়েও ইচ্ছেমতো খেলা করে পুরুষ । খেলতে খেলতে ভালো না লাগলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অন্য একটা খেলনা নিতে চায়, আবার খেলে । আর এতে যেন সাহায্য করছে বিভিন্ন ধর্মীয় শাস্ত্র । 'রামায়ণ',

'মহাভারত', প্রত্যেকটাতেই নারী যেন পুরুষ ছাড়া অসম্পূর্ণ মানুষ । আর কোনো শাস্ত্রে না থাকলে পুরুষ তাতে জোর করে তাতে ঢুকিয়েছে এই বিষয়, এবং তৈরি করে নিয়েছে নতুন আইন । প্রত্যেকটা আইনই যেন নারীকে শোষণ করার জন্য বানানো হয়েছে আর এই প্রণয়নের সময় নারীদের কথা ভাবাই হয়নি । পুরুষ নিজে নিজেই গড়ে তুলেছে এই আইন । সমালোচকের মতে --

> *"পিতৃতন্ত্রের আইন সংশ্রয়টি তার বলপ্রয়োগ সংস্থা, যার বিধিগুলো এক বহুমুখী হিংস্র খড়্গ, যা নারীর জীবনের দিকে উদ্যত হয়ে আছে কয়েক হাজার বছর ধরে, এবং ওই খড়্গের ধারাবাহিক বলি নারী । ওই বিধিগুলো তৈরি করেছে পুরুষ, তৈরির সময় নারীর কোন বক্তব্য শোনেনি ; নারী সম্পর্কে প্রথম থেকে শেষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুরুষ, তার শাস্তির সব বিধি প্রণয়ন করেছে নারী বিরোধী পুরুষতন্ত্র । পুরুষ নিজে প্রণয়ন করেছে ওই নিষ্ঠুর সংহিতাগুলো, নারীকে স্থান দিয়েছে দণ্ডিতের শ্রেণীতে ; ওই বিধিগুলোকে প্রচার করেছে ঐশী বলে ।"* (২)

আমাদের আলোচনা মুসলিম সমাজের বিয়ে, সতীন এবং তালাক ব্যবস্থা । অন্যান্য জাতির তুলনায় মুসলিম সমাজে নারীর অবস্থা বেশি ভয়ংকর । তারা বিশ্বের অন্যান্য নারীদের তুলনায় অনেক বেশি গন্ডিবদ্ধ, ফলে তারা শিক্ষার সুযোগও কম পেয়েছে । যার ফলে তাদেরকে নিয়ে খেলতে পুরুষদের অনেক বেশি সুবিধা হয়েছে । 'রামায়ণের' সীতা লক্ষণের দেওয়া গন্ডি থেকে বেরিয়ে আসার সাহস করলেও মুসলিম সমাজের মেয়েরা বেরিয়ে আসার সাহস পায়নি পুরুষতন্ত্রের ভয়ে । পুরুষ ইচ্ছামতো একের অধিক বিয়ে করে ধর্মের দোহাই দিয়ে আবার ইচ্ছামতো তালাক দেয় ধর্মের অধিকার দেখিয়ে । ধর্ম যেন পুরুষরাজ । রাজা যেমন প্রজার জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার পায় রাজতন্ত্রের বলে, তেমনি পুরুষ অধিকার পায় নারীর জীবনে ধর্মতন্ত্রের বলে । প্রাচীন কাল থেকেই নারী পদদলিত সর্বকালে, সর্বসমাজে । ধর্মগ্রন্থের নিয়মকে না জেনে বা না বুঝে ইচ্ছাখুশি নারীত্বের গ্রহণ বর্জন চলতেই থাকে । আর

এই নিয়ম মুসলিম নারীজীবনে কানায় কানায় পূর্ণ, অমাবস্যার অন্ধকারে আবৃত । ধর্মের অন্ধ অনুগামীদের এই স্বেচ্ছালোভী কার্যকলাপে মুসলিম সমাজের দৈনন্দিন সমস্যা নিয়ে কলম ধরেছেন বহু লেখক-লেখিকা এবং উপন্যাসে রচনা করেছেন বঞ্চিত, অবহেলিত মুসলিম মানুষের মনের কথা । আমরা এই বিষয়ে কিছু নির্বাচিত উপন্যাসের আলোচনা করব এই পর্যায়ে ।

এই পর্বের একটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস বেগম রোকেয়ার 'পদ্মরাগ' (১৯২৪) । এখানে বিশেষ করে সুবিধা বঞ্চিত নারীদের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেছেন লেখিকা । বিভিন্ন সমস্যাগুলির মধ্যে তালাক প্রথা, বহুবিবাহ কীভাবে নারী-পুরুষের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলে তা সাবলীলভাবে চিত্রিত করেছেন ঔপন্যাসিক । নায়ক লতীফ ও নায়িকা জয়নব ওরফে সিদ্দিকার জীবনে সমাজে প্রচলিত ইসলামি আইনের অপপ্রয়োগ তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে । লতীফ অপ্রাপ্ত বয়সে পিতৃহীন হয় । পিতামহ বেঁচে থাকায় সমস্ত সম্পত্তির মালিক পিতামহই হয় । পিতামহের মৃত্যুর পর সম্পত্তির উত্তরাধিকার হয় বড় চাচা হাজী হাবীব আলম । ফলে লতীফ, লতীফের মা ও বোনেরা সম্পত্তিহীন হয় । তারা জমিদারের সন্তান হয়েও আজ দয়ার পাত্র । যাতে লতীফ ভালভাবে পড়াশুনা করতে পারে তাই লতীফের মা ঝিয়ের মত বড় জায়ের সেবা করে । কখনও ভাশুরের মতের বাইরে যায় না । লতীফ এম এ পাশ করলে তিন বছর পর বিয়ে হওয়ার শর্তে লতীফের সাথে জয়নবের 'আক্‌দ্‌বস্তু' (বাগদত্তা) হয়ে থাকে । শুধু শুভদৃষ্টি হয়নি । তিন বছর পর লতীফ ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরলে সম্পত্তি-পিপাসু জমিদার হাজী হাবীব আলম বিয়ে ভাঙার উপায় খুঁজতে থাকে । জয়নবের দাদাকে চিঠি লেখা হয় যদি বিয়ের আগেই জয়নবের সম্পত্তি জয়নবের নামে লিখে দেওয়া হয় তবেই বিয়ে সম্পূর্ণ হবে । কিন্তু দাদা ন্যায়পরায়ণ মানুষ । সে উত্তরে বলে ১৮ বছর বয়স হলে সে নিজেই তার সম্পত্তির মালিক হবে । এই সুযোগই খুঁজছিল হাজী হাবীব আলম ; কারণ ব্যারিস্টার লতীফের দাম আগের লতীফের চেয়ে অনেক বেশি, অন্য জায়গায় বিয়ে দিলে বেশি দাম পাওয়া যাবে । তাই হাজী সাহেব লতীফের অন্য জায়গায় বিয়ে ঠিক করে ।

লতীফ বিয়ে করতে রাজি নয়, কারণ জয়নবের সাথে তার বিয়ের সমস্ত কাজ হয়ে আছে শুধু বাড়ি নিয়ে আসা বাকি । ফলে সে বেঁকে বসে । মা জানে চাচার মতের বাইরে গেলে তাদের খাবার পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যেতে পারে । তাই মা বলে --

> *"বাবা তুমি দুই বিবাহ করিলে মহাভারত অশুদ্ধ হইবে না । না করিলে হাজী সাহেব রাগ করিয়া তোমাকে এক কড়ার সম্পত্তি দিবে না ।"* (৩)

এতেও লতীফ রাজি হয়নি, সে মাকে বলে সম্পত্তির দরকার নেই, তাকে যে সুশিক্ষিত করেছেন চাচা তাই যথেষ্ট । কিন্তু বাড়ির সব গুরুজনদের চাপে পড়ে লতীফ শেষ পর্যন্ত বিয়েতে রাজি হয় । ঔপন্যাসিকের ভাষায় --

> *"..... বলিদানের ছাগলের মতো বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইলেন ।"* (৪)

লতীফের বিবাহের খবরে জয়নব ও তার দাদা সোলেমানের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে । দাদা 'আহার নিদ্রা' ছেড়ে বোনের জন্য লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদত । ইসলামে একাধিক বিয়ের সুযোগ থাকায় আজ একাজ করতে পেরেছে হাজী সাহেব লতীফকে দিয়ে । সমাজে প্রচলিত কথা এক সাথে চার জন স্ত্রীকে বিয়ে করতে পারে একজন মুসলমান পুরুষ । কিন্তু সমাজে এটা প্রচলিত নেই কি কি ক্ষেত্রে একের বেশি বিয়ে প্রযোজ্য । ফলে লতীফ তার স্ত্রী জয়নব থাকা সত্ত্বেও সালেহাকে বিয়ে করে অশান্তিতে ভুগছে । লতীফের বিয়ের পর জয়নবের দাদা সোলেমান জয়নবকে স্বাবলম্বী করে তোলার চেষ্টা করে । দাদা বলে --

> *"তুই জীবন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হ ! মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য যাহাতে তোকে কোন দুরাচার পুরুষ গলগ্রহ না হইতে হয় আমি তোকে সেইরূপ শিক্ষা দিয়া প্রস্তুত করিব । তোকে বাল-বিধবা কিম্বা চির কুমারীর ন্যায় জীবন যাপন করিতে হইবে ; তুই সেই জন্য আপন পায়ে দৃঢ় ভাবে দাঁড়া ।"* (৫)

কথামত সোলেমান প্রাণপণে জয়নবকে জমিদারি সংক্রান্ত সকল বিষয়, প্রজা পালন প্রভৃতি শিক্ষা দেয় এবং জয়নবের বয়স ১৮ বছর হলে তার সম্পত্তি তাকে বুঝিয়ে দিয়ে বলে --

> *"তোমার সম্পত্তি লাভের বিষয় আপাততঃ গোপন থাকুক । আমি একবার সেই নরাধমের বন্ধন হইতে তোমাকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়া দেখি । যদি তিনি তোমাকে 'তালাক' দেন তবে ত পরম মঙ্গল ; তোমার জীবনের গতি অন্য দিকে ফিরিবে । আর যদি তালাক না দেন তবে আর গতি কি – তোমাকে চিরদিন এ জীবন তারি তরে কাঁদিতে হইবে, অর্থাৎ তুমি নিজেকে বাল-বিধবা জ্ঞান করিবে ।"* (৬)

সোলেমানের এই উক্তি প্রমাণ করে তালাক প্রথার প্রয়োগ সমাজের প্রচলিত প্রথার মাধ্যমে হত এবং বর্তমানেও হয় । এর সঠিক প্রয়োগ না করে, সঠিক ভাবে না জেনে সুবিধাবাদী মোল্লা-মৌলবি-হুজুররা নিজের স্বার্থ নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলেন এবং আছেন যেখানে এই প্রথার সঠিক নিয়ম কেউ জানেনই না । এখানে সোলেমানের উক্তি এটাই প্রমাণ করে পুরুষ মানুষই শুধু তালাক দিতে পারে নারী পারে না । তাই সে বলছে তালাক না দিলে কোনো গতি নেই নিজেকে বাল্য-বিধবা মনে করে তার জন্য জীবন কাটাতে ।

ইসলামে নারী পুরুষ উভয়েই তালাক দিতে পারে । তালাক তিন ভাবে হয় --

১) সাধারণ – স্বামী স্ত্রীকে দেয়,

২) উভয়ে মিলে সমাধান করে তালাক হয়,

৩) স্ত্রী স্বামীকে দেয় যাকে বলে খোলা তালাক ।

এরপরও জয়নবকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নিজের পরিচয় নিয়ে শান্তিতে থাকতে দেয়নি । তাকে জমিদারি ছেড়ে সিদ্দিকা নামে তারিণী ভবনে আশ্রয় নিতে হয় ।

সেখানে ঘটনাক্রমে লতীফের সাথে দেখা হলে লতীফ অনেকভাবে চেষ্টা করে জয়নবকে ফিরিয়ে আনার । এতে জয়নবও প্রত্যাখ্যানের সুরে বলেছে --

> *"..... সেই যে সম্পত্তি লিখিয়া না পাওয়ার জন্য 'পদাঘাতে বিতাড়িত' হইয়াছিলাম, সে অবমাননা কি করিয়া ভুলিব ? তাঁহারা আমার সম্পত্তি চাহিয়াছিলেন, - আমাকে চাহেন নাই । আমরা কি মাটির পুতুল যে, পুরুষ যখন ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করিবেন, আবার যখন ইচ্ছা গ্রহণ করিবেন ? আমি সমাজকে দেখাতে চাই যে, 'সুযোগ জীবনে একবার ছাড়া দুইবার পাওয়া যায় না' ; তোমরা পদাঘাত করিবে আর আমরা তোমাদের পদলেহন করিব, সে দিন আর নাই । আমি আজীবন তারিণী-ভবনের সেবা করিয়া নারী-জাতিরকল্যাণ-সাধনের চেষ্টা করিব এবং অবরোধ-প্রথার মূলোচ্ছেদ করিব ।"* (৭)

এর পরে তারিণী ভবনের বোনেরা লতীফের অনুরোধে জয়নবকে লতীফকে গ্রহণের জন্য অনুরোধ করলে জয়নব ওরফে সিদ্দিকা দীপ্ত কণ্ঠে বলে ওঠে --

> *"আমি যদি উপেক্ষা লাঞ্ছনার কথা ভুলিয়া গিয়া সংসারের নিকট ধরা দিই, তাহা হইলে ভবিষ্যতে এই আদর্শ দেখাইয়া দিদিমা ঠাকু'মাগণ উদীয়মান তেজস্বিনী রমনীদের বলিবেন, 'আর রাখ তোমার পণ ও তেজ- ঐ দেখ না, এতখানি বিড়ম্বনার পরে জয়নব আবার স্বামী-সেবাই জীবনের সার করিয়াছিল ।' আর পুরুষ-সমাজ সগর্বে বলিবেন, 'নারী যতই উচ্চশিক্ষিতা, উন্নতমনা, তেজস্বিনী, মহীয়সি, গরীয়সী হউক না কেন, -ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার আমাদের পদতলে পড়িবেই পড়িবে !' আমি সমাজকে দেখাতে চাই, একমাত্র বিবাহিত জীবনই নারী-জন্মের চরম লক্ষ্য নহে ; সংসার ধর্মই জীবনের সারধর্ম নহে ।"* (৮)

উপন্যাসের তারিণী ভবনের আর এক নারী রাফিয়া । তার স্বামী ব্যারিস্টার । ব্যারিস্টারি পড়তে ইংল্যান্ডে গিয়ে প্রথম বছর সপ্তাহে সাতটি চিঠি লিখত, দ্বিতীয় বছর তিনটি, ক্রমে মাসে দুমাসে একটি চিঠি আসতে লাগল । এদিকে রাফিয়া স্বামীর উপযুক্ত বউ হওয়ার জন্য শিক্ষিকা রেখে ইংরেজি ও বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র শিখতে লাগল । ধীরে ধীরে স্বামী আসার সময় হলে রাফিয়া মনে মনে ভাবে সব রাগ সুদে আসলে তুলে নেবে । যখন আর পনের দিন বাকি দেবর তাকে বলে কোনোরকম রেজিস্টারি চিঠি স্বাক্ষর করে সে যাতে গ্রহণ না করে । কিন্তু স্বামীর চিঠি এলে সে নিজেকে সামলাতে পারেনি, স্বাক্ষর করে চিঠি গ্রহণ করে । পরে পড়ে দেখে তা আসলে 'তালাকনামা' --

> *"তিনি ত্যাগ পত্র দিয়াছেন, ইনি স্বাক্ষর দিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, সুতারাং তাহাদের বিবাহ-বন্ধন কলমের এক আঁচড়ে শেষ হইল ! তিনি ত ইংল্যান্ড হইতে মেম লইয়া আসিলেন । রাফিয়া পাগল হইয়া গেলেন !"* (৯)

রাফিয়ার ক্ষেত্রে যেভাবে তালাক প্রয়োগ করা হয়েছে তা আমাদের সমাজে প্রচলিত প্রথা এবং এতেও স্বার্থলোভী মানুষরা নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত থাকে এবং ধর্মের নামে ভণ্ডামি করে অহেতুক ভাবে পুরুষের হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলে দিয়ে রাফিয়াদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছে । অর্থাৎ সমাজে যে প্রথা প্রচলিত আছে তাকে ধর্মের মোড়কে জড়িয়ে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারীদের সমস্ত স্বাধীনতা হরণ করেছে । তালাকে তাদের মতামতের দাম তো দূরের কথা, মতামত চাওয়াই হয়নি । তাই জয়নব ওরফে সিদ্দিকা বলে --

> *"সমাজের এই সব নালী ঘায়ের কি কোন ঔষধ নাই ? বাতুলের সহিত চিরজীবন আবদ্ধ থাকিতে হইবে, বিনা কারণে পরিত্যক্তা হইতে হইবে, অবমানিতা হইয়া মাতালের সহিত সপত্নী সমভিব্যাহারে ঘর করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে সহোদর ভাই হাত পা বাঁধিয়া তাহার সঙ্গে পাঠাইতে চাহিবেন, স্বামী বাতায়ন উল্লঙ্ঘনে*

পলায়ন করিলেন বলিয়া স্ত্রীকে দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হইবে – ইহার কি কোন প্রতিকার নাই ?" (১০)

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর *'লালসালু'* উপন্যাসের প্রধান চরিত্র মজিদ জীবিকার সন্ধানে বাড়ি থেকে বেরিয়ে মহব্বত নগরে এসে প্রাচীন কবর দেখিয়ে কৌশলে মাজার তৈরি করে যখন পয়সা উপার্জন হতে লাগল তখন সে বাড়ি করল । জমি কিনে গৃহস্থালি শুরু করে । পুরুষ মানুষের বাড়ি-ঘর এবং হাতে পয়সা হলেই মনে এক ধরণের অসুখ হয়, শরীর কেমন কেমন লাগে, এই অসুখ ভালো করতে হলে তাকে বিয়ে করতে হয় । টাকার পরিমাণ খুব বেশি হলে অনেক সময় এই অসুখ ভালো হয় না, একের বেশি বিয়ের দিকেও ছুটে চলে । মজিদের তাই হয়েছিল । অনেকদিন থেকেই সে দেখত রহিমাকে --

"অনেকদিন থেকে আলি-ঝালি একটা চওড়া বেওয়া মেয়ে দেখছিল । দেহে যৌবন যেন ব্যাপ্ত হয়ে ছড়িয়ে আছে, বিশাল তার রূপ । দূর থেকে আবছা আবছা তার প্রশস্ত দেহ দেখে শীর্ণ মজিদ জ্বলে উঠেছিল ।" (১১)

বিয়ে করার পরও মেয়ে মানুষ দেখলে তার চোখ যেন চকচক করে ওঠে । হাসুনির মার উজ্জল কাঁধ দেখে মজিদের চোখ জ্বলে উঠেছিল ।

এরপর খালেক ব্যাপারীর স্ত্রী অন্য পীরের 'পানি পড়া' আনতে গিয়ে ধরা পড়লে মজিদ নিজেই অসুখ সারানোর জন্য আমেনা বিবিকে রোজা করিয়ে মাজারে এনে চার পাশ ঘোরাতে গিয়ে বিবির পায়ের একটু অংশ দেখতে পায় মজিদ । তাতে অন্ধকারে তার চোখ যেন জ্বল জ্বল করে ওঠে । তার ভেতরটা যেন উথাল-পাথাল হতে থাকে, যেন নেশা ধরে পায়ের সৌন্দর্যে । ঔপন্যাসিকের ভাষায় --

"..... কিন্তু পাল্কি থেকে নামবার সময় তার যে সাদা সুন্দর পা-টা দেখেছিলো, সে-পাই তার মনে সাপকে জাগিয়ে তুলেছে । সাপ জেগে উঠেছে ছোবল মারার জন্য । তার জিহ্বা লিকলিক করে,

উদ্যত দীর্ঘ গলা বেয়ে উঠে আসে বিষ । সুন্দর পা-দেখে স্নেহ-মমতা উঠে না এসে, আসে বিষ । স্নেহ-মমতাই যদি গলগলিয়ে, গদগদ হয়ে জেগে উঠতো তবে মজিদ রূপালি ঝালর-ওয়ালা চমৎকার সালু কাপড়টাই ছিঁড়ে এখানকার ঘরবাড়ি ভেঙে অনেক আগে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে যেতো ।" (১২)

দুর্বল হয়ে আমেনা বিবি অজ্ঞান হয়ে গেলে মজিদ খালেক ব্যাপারীকে দিয়ে তালাক দিতে বলে । খালেক ব্যাপারী কারণ জিজ্ঞাসা করলে মজিদ বলে বলা যাবে না । আসলে মজিদের রাগ হল সে থাকতে অন্য পীরের কাছে পানি পড়া নিতে যাওয়া । ঔপন্যাসিকের ভাষায় --

"যে-আমেনা বিবির পীরের পানি খাবার সখ হয়েছিল সে আমিনা বিবির ওপর – আকার ইঙ্গিতে বা মুখের ভাষায় প্রকাশ না করলেও – মজিদের মনে একটা নিষ্ঠুর রাগ দেখা দিয়েছিল । তার একটা নিষ্ঠুর শাস্তিও সে ঠিক করেছিল । আজ সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোয় আমেনা বিবির সাদা কোমল পা দেখে শাস্তি বিধানের প্রবল ইচ্ছা বিন্দু মাত্র প্রশমিত না হয়ে বরঞ্চ আরো নিষ্ঠুরতমভাবে শাণিত হয়ে উঠেছিল । কিন্তু অপ্রত্যাশিত ভাবে অসময়ে আমেনা বিবির মূর্চ্ছা যাওয়া সমস্ত কিছু যেন গোলমাল করে দিল । মুঠোর মধ্যে এসেও সে যেন ফসকে গেল ..... তাকে নিষ্ঠুর ভাবে আঘাত করতে সুযোগ দিয়েও দিলো না । দিয়েও দিলো না বলে মেয়েলোকটি যেন চরম বাহাদুরি দেখালো, সমস্ত আস্ফালনের মুখে চুন দিল ।" (১৩)

খালেক ব্যাপারী মনে মনে নানা কথা ভাবে কিন্তু এও ভাবে যে মজিদ আল্লাওয়ালা মানুষ সে সবই জানে তাই তালাক দিতে বলেছে, সবকিছু খুলে বললে আমি কষ্ট পেতে পারি । ফলে খালেক আমেনাকে তালাক দিয়ে দেয় । এইভাবে ক্ষমতাধারী মানুষরা ক্ষমতা হারানোর ভয়ে যারা তার আয়ত্তের বাইরে যেতে চায় তাকে সরিয়ে দেয় । মজিদও তাই করে । সমালোচকের মতে --

"আসলে বিচার কর্তা যদি হয় পুরুষ আর তার হাতে যদি থাকে বাড়তি কোনো ক্ষমতা তাহলে যে কোনো সময়েই একটা মেয়েকে দোষী সাব্যস্ত করে সে তার নিষ্ঠুর শাস্তি বিধান করতে পারে, তার জন্য সাক্ষ্য প্রমাণ লাগে না, পরিবারে না, সমাজে না, ধর্মে না এমনকি রাজনীতিতেও না ।" (১৪)

এই চকচকে পা মজিদের ভেতরের যে সাপকে জাগিয়ে তুলেছিল তাকে দমাতে পারেনি বা দমায়নি মজিদ । কারণ সে নিজের ক্ষমতা ব্যবহার করলেই আবার বিয়ে করতে পারবে । কিছুদিনের মধ্যে ছোট জমিলাকে আবার বিয়ে করে আনে । যে জমিলার এখন খেলার কথা তাকে বিয়ে করে এনেছে বাপের বয়সি মানুষ । জমিলাই মজিদের সমস্ত আস্ফালনে জল ঢেলে ঠাণ্ডা করে দেয় । জমিলাকে জোর করে মাজারে নিয়ে যেতে চেষ্টা করলে তার মুখে থু থু ছিটিয়ে দেয় জমিলা । ফলস্বরূপ মজিদ তাকে ঝড়বৃষ্টির রাতে সারা রাত মাজারে বেঁধে রাখে ।

আবু ইসহাক তাঁর *'সূর্যদীঘল বাড়ী'* (১৯৫৫) উপন্যাসে সমকালের বাস্তব চিত্র অঙ্কন করেছেন । ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ, ১৯৪৬ সালের দাঙ্গা, ১৯৪৭ সালের দেশভাগ, দেশ স্বাধীনের পরে কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি ঘটনায় ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে এই উপন্যাসের চরিত্ররা । এর সাথে যোগ হয়েছে ধর্মের চোখ রাঙানি । দুর্ভিক্ষে বা দাঙ্গায় যখন এমনি মানুষের প্রাণ নিয়ে টানা-টানি পড়ে তখন মানুষের প্রাণ না বাঁচলেও ধর্মের প্রাণ বাঁচাতে উঠে পড়ে লাগে একদল স্বার্থপর মানুষ । এই উপন্যাসের গদু প্রধানরা তারই দৃষ্টান্ত । যে দুর্ভিক্ষে সমাজের সবাই সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়, যেখানে কারোর হাত থাকে না বা সাধারণ মানুষের হাত থাকে না সেখানে একজন সাধারণ পুরুষ থেকে একজন সাধারণ নারী দ্বিগুন দুর্ভিক্ষে পড়ে বা উভয় সঙ্কটে পড়ে । একে দুর্ভিক্ষ, তার ওপর সমাজপতিদের বা ধর্মীয় চোখ রাঙানি । এই উভয় সঙ্কটে পড়ে জয়গুন ময়মুনেরা কীভাবে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই উপন্যাস । সমালোচকের মতে --

"বিপর্যস্ত অর্থনৈতিক-সামাজিক-মানসিক ঘাত-প্রতিঘাতের পরিসরে তাঁর চরিত্ররা দিশেহারা । ধর্মের চোখ রাঙানি, সামাজিক মর্যদা ও আর্থিক ক্ষুধা - কোনটাকে জয়গুন মান্যতা দেবে – এই সমূহ দ্বন্দ্ব তার হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করেছে, বলিষ্ঠ করেছে তার চরিত্রকেও ।" (১৫)

যে সমাজে গদু প্রধান, করিম বক্স, ইমাম সাব্‌রা প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম দুর্ভিক্ষে পড়ে সেখানে জয়গুনের সাথে আরও যোগ হয় এইসব মানুষের ধর্মীয় মোড়কে মোড়া বিভিন্ন অত্যাচার । সবার সাথে বাঁচার আশা নিয়ে জয়গুনও গ্রামে ফিরে আসে । কিন্তু তাদের সূর্যদীঘল বাড়ী বলে ফকীর জোবেদন আলীকে দিয়ে বাড়িতে তাবিজ-কবজ করে । এবং ফকীর একটা পিতলের কলসি দাবি করে । চাল–বাঁশ দিলেও জয়গুন কলসি দিতে পারে না, দেরি হয় । এই সুযোগে সে প্রায়দিন জয়গুনের সাথে দেখা করে তার হাতের পান খেতে চায়, গল্প করতে চায় । একদিন ফকীর জয়গুনের দেওয়া পান চিবোতে চিবোতে বলে --

"বেয়ানের আতের পান খাইতে কী মুলাম । এক্কেরে মুখের সাথে মিশ্যা যায় । যেই আতের পান এত মুলাম, হেই আতখানাও না জানি কেমুন । শরীর খানও বুঝিন্ তুলতুল করে তুলার মতন ।" (১৬)

এই বলে নরম হাত ধরতে যায় । জয়গুন চুনের কৌটো ফকিরের কপালে ছুঁড়ে মেরে নিজেকে রক্ষা করে । অর্থাৎ নারীকে বা তার তুলতুলে শরীরই ভোগ করতে চায় পুরুষ । জয়গুনের প্রথম বিয়ে হয় জব্বল মুন্সীর সাথে । হাসু জন্মানোর পর মুন্সী মারা গেলে করিম বক্সের সাথে বিয়ে হয় । কিন্তু এক ছেলে কাসুকে নিজের কাছে রেখে দুই মেয়েকে জয়গুনকে দিয়ে দুর্ভিক্ষের সময় অকারণে তালাক দেয় জয়গুনকে । পুরুষের যতদিন মন চায় ততদিন তুলতুলে শরীরকে ভোগ করে । এতে কোনরকম একটু এদিক ওদিক হলেই চলে অমানবিক প্রহার । এর আগের বউকেও মেরেই ফেলে করিম বক্স । জয়গুনেরও শরীরের কোনো জায়গা বাদ নেই লাঠির আঘাতের । এই মার দেখে আর এক নারী শাশুড়ি তাকে শান্তনা দিত ভয়ঙ্কর গল্প শুনিয়ে --

"ওয়াতে কী অইছে বউ ! মরদগুনে যেই পিডে মারব, হেই পিড বিস্তে যাইব । যেই আতে, যেই পায় মারব, বেবেক বিস্তে যাইব । তুই বুঝিন কাড়ুরিয়ার বউর কিচ্ছা হোনস নাই ? তয় হোন্ : রসুল – করিম একদিন বিবি ফাতেমারে কইল – "অমুক জাগায় এক কাড়ুরিয়া থাকে । তার বউ আট বিস্তের বড় বিস্তে যাইব ।" বিবি ফাতেমা জিগাইল – "ক্যান্ যাইব ?" রসুল – করিম কইল –"যাও গিয়া দেইখ্যা আহ একদিন ।" বিবি ফাতেমা কাড়ুরিয়ার বাড়ী গিয়া দ্যাহে কী, ও মা ! ঘরের দুয়ারে হাজাইয়া থুইছে দাও, লাডি, ঠ্যাঙগা দড়ি । বিবি ফাতেমা কাড়ুরিয়ার বউরে জিগাইল – "অত লাঠি ঠ্যাঙগা এমুন কইর‍্যা রাখছে কে ?" সে জ'ব দিল – "আমি ।" জিগাইল, "ক্যাঁ ?" জ'ব দিল – "যদি সোয়ামির খেজমতে তিরুডি অয়, তয় এই লাডি দিয়া আমারে পিডাইব । কামের সময় কোতায় লাডি বিচ্‌রাইব ? এই এর লাইগ্যা আতের কাছে আইন্যা রাখ্‌ছি ।" জিগাইল, "দাও রাখছ ক্যাঁ ?" জ'ব দিল – "যদি মনে লয় কাটব ।" (১৭)

কিন্তু জয়গুন জানে এই কাহিনি । কারণ মুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে আর জানবে না এই কাহিনি ! ক্ষমতাশালী পুরুষ সবসময় ধর্মকে নিজের মতো করে কাহিনি গড়ে তুলে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করে যায় । জয়গুন তবুও কিছু বলেনি, মুখ বুজে সহ্য করে এবং এটাই নারীর ভাগ্য বলে মেনে নেয় । কিন্তু প্রয়োজন ফুরালে তাকে তাড়িয়ে দেয় শুধুমাত্র তালাক কথাটি উচ্চারণ করেই । ফলে তার সমস্ত দায়িত্বই শেষ । সে একজন ধার্মিক ব্যক্তি কারণ সে ধর্মমতে তালাক দিয়েছে । ফলে জয়গুনকে সন্তানদের বাঁচানোর তাগিদে চালের ব্যবসা এবং পরের বাড়ি কাজ করতে বেরোতে হয়েছে । এখানেও হাজির ধর্মের লাঠি । তাকে নানারকম ভয় দেখিয়ে গৃহবন্দি করে গদু প্রধান নিজে এক ফন্দি করে । সে শফীর মাকে দিয়ে বিয়ের প্রস্তাব পাঠায় জয়গুনের কাছে । শফীর মা প্রধানের শিখিয়ে দেওয়া কথাগুলি বলে ধন-দৌলতের লোভ দেখায়, রাজরাণী হয়ে থাকার কথা বলে । কিন্তু জয়গুন দুই বার যেখানে ঠকেছে সেখানে আর যেতে রাজি নয় । সে জানে পুরুষের একই শরীর বেশিদিন ভালো লাগে

না তাই আজ আকর্ষণ কিন্তু কিছুদিন গেলেই যে বিকর্ষণ হবে তা বুঝতে পারে জয়গুন । তাই সে আর ঠকতে রাজি না, রাজি নয় আর স্বপ্ন দেখতে । তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার শোধ তোলে গদু প্রধান ময়মুনের বিয়ের আসরে । ক্ষমতার জোরে মৌলবিকে হাত করে ধর্মকে অস্ত্র করে গৃহবন্দি করে রাখতে চায় জয়গুনকে । ফলে এতে রোজগার বন্ধ হলেই হয়ত তার প্রস্তাব গ্রহণে বাধ্য হবে জয়গুন । জয়গুন বাধ্য হয়েই তওবা করে বাইরে না যাওয়ার এবং ময়মুনের বিয়ে হয়ে যায় অসম বয়সের ওসমানের সাথে । কিন্তু এখানেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজ খাঁড়া হাতে দাঁড়িয়ে । ময়মুন অনেক ছোট বলে তাকে ভাত খাওয়াতে রাজি নয় শাশুড়ি । কারণ ময়মুন পুরুষের ভোগের যোগাড় দিতে পারে না । শাশুড়ির কথায় --

> *"হোন কই, এই রাক্কস রাহনের কাম নাই । হেদিন ওসমানের ঘরে দিছিলাম । শরমেরও কতা । রাইতে হেই কী চিক্কইর । আর এট্টু অইলে চৌদ্দ বাড়ির মানু একখানে কইর‍্যা লইত ? ছিঃ, ছিঃ । অ-ঘিন, অ-ঘিন । বোঝলাম এইডা জুয়ান অইতে অইতে আমার ওসমান ঠুণ্ডা অইয়া যাইব । আর এদ্দিন তক্তে বহাইয়া খাওয়াইলে ফউত অইয়া যাইবা, কইয়া রাখলাম ।"* (১৮)

অপুষ্টিতে ভোগা ময়মুন জোয়ান স্বামী ওসমানের শারীরিক চাহিদা পূরণ করতে না পারার জন্য শাশুড়ি তাকে খাইয়ে বড় করতে নারাজ । কেন পারবে না ময়মুন । সে কি জানে না যে সে নারী, তাকে সবসময় চাহিদা পূরণ করতে হবে পুরুষের, এটাই যেন ভাব শাশুড়ির । নিজের জীবন দিয়েও যেন পুরুষের চাহিদা পূরণ করতে বাধ্য নারী । এই বাস্তব চিত্রই তুলে ধরলেন ঔপন্যাসিক । সমালোচকের মতে --

> *"আবু ইসহাকের সন্ধানী দৃষ্টিতেও সূক্ষ্মভাবে ধরা পড়েছিল দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট মানুষের মরণ-পণ লড়াই আর সে সঙ্গে শোষক শ্রেণীর নেকড়ে দৃষ্টি, যে – দৃষ্টি শুধুই নারীর রক্তমাংসের স্বাদ পেতে চায় । ..... তাই তাকে নিজের বাঁচার খিদে ভুলে গিয়ে অন্যের বাসনার ক্ষিদে মেটাতে হয় ।"* (১৯)

আর ময়মুন নিজের মাংসের স্বাদ দিতে না পারায় তাকে বাড়ি থেকে অকারণেই বের করে দেওয়া হয়েছে ।

এই ময়মুনের দায়িত্বও এসে মায়ের উপর পড়ে । এবং কাসু হঠাৎ অসুস্থ হলে করিম বক্স তাবিজ-কবজে বিশ্বাস করে, কিন্তু জয়গুন নিজের সমস্ত সম্বল বেঁচে করিম বক্সের বাড়িতে গিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে এবং নিজে সেবা-যত্ন করে তাকে সুস্থ করে তোলে । সে সময় করিম বক্সের আবার নজর পড়ে জয়গুনের দিকে । জয়গুনের চেহারা যেন তাকে নেশা লাগায় । একদিন যাকে অকারণে তালাক দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিল তাকেই আজ আবার চায়, চায় তার শরীর । সে আবার বিয়ের প্রস্তাব দেয় জয়গুনকে । এবং বলে 'শরা-শরিয়ত' মতেই সে বিয়ে করবে । এতেও জয়গুন রাজি না হলে সে বর্তমান স্ত্রী আঞ্জুমানকেও তালাক দিতে রাজি --

> *"ক্যা, সতিনের ঘর বুইল্যা ? যদি একবার মুখ ফুইট্যা কও সতিনের ঘর করতাম না, তই ফুলির মা-রে রাইত পোয়াইলেই খেদাইয়া দিতে পারি ।"* (২০)

অর্থাৎ নারী যেন এদের কাছে খেলনা স্বরূপ । আজ একে ভালো লাগল তাই বর্তমানকে তালাক দিয়ে দিলেই হল, আবার কোনদিন একেই ভালো না লাগলে আবার তালাক দেবে যেমন পূর্বে একবার দিয়েছিল । এখানেও আবার তারা শরিয়ত মতে করতে চায় বিয়ে এবং তালাক । অর্থাৎ শরিয়তকে যেন পৈত্রিক সম্পত্তি করে নিজেদের সুবিধার্থে কম শিক্ষিত বা লোভের দ্বারা গড়ে নিয়ে নারীকে ইচ্ছেমতো ব্যবহার করে চলে প্রতিটি পুরুষ । এখানে নারী অসহায় কারণ শরিয়ত আছে পুরুষের কাছে, যা শুধুমাত্র তাদের সুবিধার্থে তৈরি । সমালোচকের মতে --

> *"পূর্ব বাংলার নারায়ণগঞ্জ শহরের কাছাকাছি এক গ্রামের চিত্র লেখক তুলে ধরলেও, এছবি পূর্ব ও পশ্চিমবাংলার অশিক্ষিত অল্পশিক্ষিত কুচক্রী অবস্থাবান ও মৌলবি পরিচালিত প্রায় সব মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামের সঙ্গেই মিলে যায় । অসংখ্য জয়গুন ছড়িয়ে আছে*

গ্রামজীবনের আনাচেকানাচে । করিম বক্সের স্বচ্ছল গ্রামবাসীরা লালসার পরিতৃপ্তি পূরণে জয়গুনের মত নারীদের বিয়ে করে । বিনা দোষে দুর্ভিক্ষের দিনেও কন্যা সন্তানসহ তালাক-ধাক্কায় তাদের পথে নামতে হয় । সেই নিদারুণ অধর্মকে রোধ করার প্রয়াস দেখা যায় না অল্পশিক্ষিত মৌলবি-ধর্মজীবি সম্প্রদায়ের । ধর্মের ওপর আবার চলে অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব । গদু প্রধানের লালসার শিকার হয়ে, চতুর্থ স্ত্রী হতে অস্বীকার করায় জয়গুনদের মতো নারীদের ধর্মীয় বিধান আর আর্থিক ক্ষমতার ষড়যন্ত্রের যাঁতাকলে আটকা পড়তে হয় । ইসলামী বিধানকে মুসলিম পিতৃতন্ত্র ইচ্ছেখুশি স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার করে এভাবেই মুসলিম নারীদের শোষণের মাত্রাকে তীব্র করে তোলে ।" (২১)

ইসলাম ধর্মের ধর্মীয় নেতারা নারীকে যে পূর্ণ মানুষ মনে করে না তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত শহীদুল্লাহ কায়সারের *'সংশপ্তক'* উপন্যাসে রাবুর বিয়ের প্রসঙ্গ । ছোট কোমল সুন্দর কচি মেয়ে রাবু একটু বড় হতেই অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক না হতেই বাবা দরবেশ সাহেব হঠাৎ নিজের বয়সের এক মাতাল পীরের সাথে বিয়ে দিয়ে দেয় জোর করে । এতে রাবু যেন হতভম্ব হয়ে যায় । তার যেন কিছুই করার থাকে না । আরিফা চেষ্টা করে বিয়ে ভাঙার । কিন্তু পারে না --

"এই রাবু খবরদার বলছি । ঘর থেকে এক পা নড়িস কি কখনো তোর মুখ দেখব না । ..... ঘর ছেড়ে বারান্দায় এলো রাবু । গোসলখানার দিকে মোড় নীল । দু'হাত মেলে ওর পথটা আগলে দাঁড়াল আরিফা । উন্মাদ ব্যাকুলতায় চেঁচিয়ে উঠল আরিফাঃ তুইও কি পাগল হলি রাবু ? ওই বুড়টাকে বিয়ে করবি তুই ? চালচুলো আছে ওর ? আর আমি হলফ করে বলছি ও ব্যাটার নিশ্চয় বউ রয়েছে কয়েক জোড়া । শেষে কি সতীনের পানি টানবি তুই ? রাবুর কোমরটা শক্ত করে জড়িয়ে ধরে আরিফা ।" (২২)

কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেনি কেউ । মাঝরাতে কলেমা পড়ে 'নিকাহ্' পড়া হয়ে গেল মাতাল দরবেশের সাথে মাত্র এক টাকা পাঁচ পয়সা মোহর দিয়ে । এই অল্প মোহরানা নিয়ে ঝামেলা করতে চেয়েছিল কিন্তু কাবিননামা সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ায় আর কিছু করার থাকে না । ফলে একটা ছোট্ট ফুটফুটে মেয়েকে যেন আগুনে ঝাঁপ দিতে বাধ্য করে এই সমাজ --

> *"মুখ টিপে টিপে মিষ্টি মিষ্টি হাসত সেই মেয়েটি । চৌদ্দ বছরের রাবু । মৃতা মায়ের বিয়ের শাড়ি বেনারসি আর বিয়ের বিছে হারখানা পরে ও এলো বাসরঘরে । পিতার বৃদ্ধ পিরের আলিঙ্গনে ও-পেল নারীত্বের প্রথম অভিজ্ঞতা । হয়তো শেষ । পুরুষ অভিজ্ঞতা হয়তো আর কখনো আসবে না ওর জীবনে । হয়তো চিরকালের জন্যই ওর অচেনা থেকে গেল পুরুষের সেরা সম্পদ যৌবন নামের সেই পরম বিস্ময় ।"* (২৩)

তবে জাহেদ বাড়িতে এসেই সবাইকে নিয়ে লাঠিপেটা করে তাড়ায় ভণ্ড পীরের দলকে । রাবুর বাবা দরবেশ কোনো অস্ত্র না পেয়ে ধর্ম নামক মোক্ষম অস্ত্র ব্যবহার করে বাড়ি ছাড়ে । সে সবাইকে অভিশাপ এবং ধর্মের অবমাননার শাস্তির কথা বলতে বলতে বাড়ি ছাড়ে --

> *"শুধু মেয়েকে অভিশাপ দিয়েই ক্ষ্যান্ত হলো না দরবেশ । এ বাড়ির সকলের বিরুদ্ধেই তার নালিশ । মুনাজাতের ভঙ্গিতে আকাশের দিকে হাত তুলল দরবেশ, কাঁপা কাঁপা গলায় ফরিয়াদ পাঠাল আল্লাহর দরবারে, ইয়া আল্লাহ, ঢালো তুমি, লা-নত ঢালো । ছারখার করো এই শয়তানের আড্ডা ।"* (২৪)

রাবু কলকাতায় পড়াশোনা করে বিভিন্ন আন্দোলনে ক্যাম্প, সভা-সমিতি করে বেড়ালে একদিনের বৃদ্ধ মাতাল স্বামী কর্তব্য পালনের নামে চিঠি লিখে ভয় দেখায়, শোনায় নরকের শাস্তির কথা । সে বীভৎসভাবে আল্লাহ্র ভয় দেখিয়ে চিঠি লেখে রাবুকে --

"..... শুনিলাম আপনি পর্দা কলেজ ছাড়িয়া এখন সম্পূর্ন বেপরদা হইয়াছেন এবং বেগানা লোকজনের সঙ্গে হরদম ঘোরাফেরা করিতেছেন (নাউজুবিল্লা...) । আপনি কেন এভাবে নিজের ওপর এবং ভবিষ্যতের আওলাদ ফরজন্দের ওপর লানত ডাকিয়া আনিতেছেন আমার আদনা বুদ্ধিতে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না । আপনি কত বড় নেকবক্ত দরবেশের সাহেবজাদী, কত বড় পীরের জেনানা, এ-কথা কি ভুলিয়া গিয়াছেন ? নিশ্চয় আপনার ওপর শয়তান ভর করিয়াছে, নচেৎ আপনি কী-ভাবে এসব গোনাহ্‌র কাজে লিপ্ত হইতেছেন ।" (২৫)

এরপর সে বিভিন্ন রকম পরামর্শ দেয় স্ত্রীকে --

"আল্লাহ্‌তালার এই সতর্ক বাণী মনে রাখিয়াই আমি আপনাকে বহুত নসিহত করিয়াছি, চিঠিপত্র মারফত বহুত হেদায়ত করিয়াছি । কিন্তু মনে হইতেছে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ভিন্নরূপ । আপনি সৎপথে ফিরিয়া আসিবেন না এবং মৃত্যুর পর অনন্তকাল দোজখের ভীষণ অগ্নিতে পুড়িতে থাকিবেন । এইরূপই সাব্যস্ত করিয়াছেন । যাহা হোক স্বামী হিসাবে আমার কর্তব্য পালনে আমি বিরত হইব না । কেননা বেওকুফ দুরাচারিণী স্ত্রীদের প্রতি স্বামীর কর্তব্য সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তায়ালাই কোরানে ফরমাইয়াছেনঃ 'প্রথমে তাহাকে বুঝাও স্বামী-স্ত্রীর আচার ব্যবহার ও নারীর আদর্শ ইত্যাদি সম্বন্ধে তাহাকে নসিহত করো, যদি তাহাতেও সে ভালো না হয়, তবে তাহার বিছানা পৃথক করিয়া দাও । ইহাতেও যদি সে ভালো না হয় তবে তাহাকে শাস্তি দাও' ।" (২৬)

পীরসাহেব বিবি স্বামীর কথা না শুনলে যে শাস্তি হয় তা বললেন, কিন্তু বিয়ে করার সময় যে মতামত নিতে হয় এবং বিবির দায়িত্ব পালন করতে হয়, না করলে কি শাস্তি তা বেমালুম ভুলে গেলেন ।

অন্যদিকে রিহানা ধনী ঘরের মেয়ে । সবসময় চিঠি লিখত মালুকে কিন্তু ঠিকানা লিখত না । সে যে মালুর গানের এবং মালুর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে এটা মালু বুঝতে পারে । একদিন শো করতে গিয়ে দেখা হয় রিহানার সাথে । এই মেয়েটি কৌশলে ধীরে ধীরে মালুকে গ্রাস করে । সে সবসময় মালুকে নিয়ে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াত । বাবা জানতে পারলে খালাত ভাই আহসানের সাথে বিয়ে ঠিক করে রিহানার । খবর পেয়ে রিহানা পালিয়ে যায় মালুর কাছে এবং মালুকে সে নানাভাবে সাহস যোগায় এবং বিয়ে করে । দিন যতই যায় ততোই মোহ কমতে থাকে রিহানার । একসময় মালুর বাসা আর ভালো লাগে না রিহানার । সে বাসা পরিবর্তন করে যার সাথে তার বিয়ে ঠিক হয়েছিল সেই খালাত ভাইয়ের বাড়িতে ভাড়া নেয় । সেখানে গিয়ে রিহানার ধীরে ধীরে মালুর প্রতি পুরো মোহ কেটে যায় । সে প্রায় সময় আহসানের সাথে বাইরে কাটাত, তার ঘরেই থাকত । এই নিয়ে মালু কিছু বললেই সে সব কিছুর জন্য মালুকেই দোষী সাব্যস্ত করে । মালু অনেক দিন এই আগুনে জ্বলে । রিহানা আহসানদের সাথে থাকে । মালু তাকে বুঝিয়ে বলে তাকে না জ্বালিয়ে নিজের সুবিধামত আলাদা হয়ে গেলে দু'জনই বেঁচে যায় ।

কিন্তু রিহানা বলে, 'আমি তোমার এখনো বিয়ে করা বউ' । রিহানা মুখে বউ বললেও সে মালুকে সহ্য করতে পারত না, তার কাছে আসত না দিনের পর দিন । কিন্তু নিজের দায়িত্ব পালন না করলেও সে যে তার বউ তা স্মরণ করিয়ে দেয় মালুকে । শেষ পর্যন্ত মালু তাকে না পেয়ে গ্রামের রাবুর খারাপ খবরের চিঠি পেয়ে গ্রামে আসতে বাধ্য হয় । মালু নিজের সর্বস্ব দিয়েও বড় লোকের মেয়েকে খুশি করতে পারেনি । ফলে দেখা যায় বিবাহিত জীবনে শুধু পুরুষই নারীদের নির্যাতন করে না ; কখনো কখনো নারীরাও করে ।

ঔপন্যাসিক আবুল বাশার সত্যের মধ্যে সৌন্দর্য ও সৌন্দর্যের মধ্যে সত্যকে খোঁজার নিরন্তর চেষ্টা চালিয়েছেন । তিনি কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মমুক্ত সমাজ গড়তে চেয়েছেন । কিন্তু ধর্ম মানুষের মধ্যে, মানুষের মনে কুসংস্কারচ্ছন্ন হয়ে থাকতেই ভালোবাসে । বিভিন্ন সময় লেখকের চারদিকে ঘটে চলা বাস্তবতা, মুসলিম সমাজের

কলুষতা, নারী নির্যাতন ভাবাত লেখককে । তিনি সবসময় পালিয়ে যেতে চাইতেন এই ধূসরাচ্ছন্ন সমাজ থেকে, জীর্ণ পচাগলা ধর্মীয় বোধ থেকে । ঔপন্যাসিকের কথায় --

> *"পালাব কোথায় ? উপায় হচ্ছে লেখার মধ্যে পালানো । ঠিক এক আত্মগোপনের কেতায় । একভাবে দেখলে আমার লেখা, আমারই জীবন, যা টুকরো-টুকরো হয়ে ছড়ানো, যেটুকু জীবন নয়, তা আমার লেখাই নয় ।"* (২৭)

ঠিক একইভাবে প্রায় দু'শ বছর আগে রোমান্টিক কবি কীটস্ বলেছেন --

> *"Away ! away ! for I will fly to thee, Not charioted by Bacchus and his pards, But on the viewless wings of poesy."* (২৮)

কবি কীটস্ যেভাবে কবিতার অদৃশ্য পাখায় ভর করে পালিয়ে যেতে চেয়েছেন জীবনের দুঃখ-কষ্টগুলি থেকে, ঠিক একইভাবে ঔপন্যাসিক আবুল বাশারও চেয়েছেন ধর্মের কঠোর বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে এসে সাহিত্যের মধ্যে নিজের কল্পনার সমাজ গঠন করার । তিনি তাঁর আশেপাশের মানুষের জীবন বিশেষত নারীদের নিয়ে তৈরি করেছেন তাঁর উপন্যাসের আঙ্গিক । সমাজে মুসলিম নারীর অবস্থান ব্যাথিত করেছে লেখককে । তাঁর কথায় --

> *"আমি প্লট তৈরি করি মূলত ব্যতিক্রমী নরনারীতে আর তার সঙ্গে জুড়ে দিই অন্ধ একটি সমাজকে, নারীর দুর্গত, চরম বিপন্ন জীবন এবং পুরুষের পাপের ভারবাহী নারী প্রকৃতিই আমার বয়ান ।"* (২৯)

এই নারীর কথা নিয়ে রচিত তাঁর প্রথম উপন্যাস *'ফুলবউ'* । 'ফুলবউ' উপন্যাস ১৯৮৭ সালে শারদীয় দেশ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় এবং ১৯৮৮ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় । বাড়ির পাশে দুই নদী যেমন লেখকের কবিত্ব-সত্তাকে জাগিয়ে তুলেছে তেমনি পারিপার্শিক সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় পরিবেশ আবুল বাশারকে 'ফুলবউ' রচনা করতে বাধ্য করেছিল । মুসলিম সমাজ নবজাগরণের যুগ পার করে

আধুনিক যুগে এসেও কীভাবে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করে নিজেরাই অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে ; ধর্মের সঠিক অর্থ না বুঝে কীভাবে ধর্মের নামে একাধিক বিয়ে, তালাককে নিত্য দিনের বা সাধারণ ঘটনায় পরিণত করেছে, ধর্ম বা ধর্মের বাণী নিয়ে কীভাবে ব্যাবসায় মেতে উঠেছে এবং মেয়েদের নির্যাতন করে গেছে তাদের নিজেদের সম্পত্তি হিসাবে একদল গোঁড়া মোল্লা তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই 'ফুলবউ' । তাঁর কথায় --

> *"কেন 'ফুলবউ' এর জন্ম দিয়েছিলাম ? ছেলেবেলা থেকে দেখেছি মুসলমান সমাজের মেয়েরা শুধু পর্দানশিল নয়, তারা উপেক্ষিত, নির্যাতিত ও অবহেলিত । ফলে এই বিষয়ে লেখার দায়বদ্ধতা থেকেই যায় ।"* (৩০)

সমকালে তাঁর আশেপাশের মুসলিম সমাজের ধর্মীয় গোঁড়ামি নারীর শরীর এবং মনকে কীভাবে ক্ষত-বিক্ষত করেছে তার বাস্তব চিত্র উঠে এসেছে 'ফুলবউ' উপন্যাসে । নারীকে গরু পেটা লাঠি ব্যবহার করে মারতে মারতে মেরে ফেলাটাও তাদের কাছে ছিল নিজের অধিকার । লেখকের কথায় --

> *"চাষী তার পাল্টি দিয়ে, যাকে বলে হাতলাঠি, তাই দিয়ে গরু মারত সেই পাল্টি দিয়ে বউকেও মারত । প্রত্যেক বছর আমাদের অঞ্চলে মানুষ খুন হত ।"* (৩১)

কেন মানুষ খুন হত, কেন মানুষের অত্যাচারে বউরা মরছে তার উত্তর খুঁজে চলেন ঔপন্যাসিক --

> *"প্রত্যেক বছর মানুষ খুন হত কেন ? জবাব আমি কার না কাছে চেয়েছি ?"* (৩২)

ঔপন্যাসিক মার্কস-মহম্মদ-ফ্রয়েড প্রত্যেকের কাছে যেন জিজ্ঞাসা করে চলেন তাঁর প্রশ্ন । কিন্তু তাদের কাছেও যেন তিনি যথেষ্ট পরিমাণে নারীর কথা পাননি । তাঁর মতে নারীকে পুরুষ শুধু মাত্রই যৌন লালসার শিকার করেছে আর ক্ষমতার আসনে বসে ইচ্ছামতো ব্যবহার করেছে । পুরুষ শুধুমাত্র ধর্ম চিন্তা আর বেহেস্তের হুরির চিন্তা তথা

যৌনচিন্তা করে গেছে । তাই দেখা যায় যারা ধর্মীয় শিক্ষা দেয় তার ক্ষিদা মেটানোর জন্য প্রায় সবারই একের বেশি স্ত্রী থাকে । তারা হুরির গল্প বলে সবার কাছে টাকা আদায় করে । লেখকের কথায় --

> *"পুরুষ এক চির ক্ষুধার্ত জীব । তার লালসার শেষ নেই । সর্বক্ষণ যৌনচিন্তা করে এমন লোক অনেক দেখেছি । নুরিহুরির কেচ্ছা না আওড়ালে তাদের চলত না । বেহেস্তে যে-লোকের জায়গা হবে, তার সেবায় থাকবে সত্তর জন হুরি অর্থাৎ অপ্সরা । আর প্রতিটি স্ত্রীলোক পাবে, মাত্র একজন গুলেমান । ..... যতযন ধর্মীয় বক্তা কোরান-হাদিস বয়েত করতে ধর্মসভায় আসত, তাদের অধিকাংশেরই একাধিক পত্নী এবং অসংখ্য সন্তান । এরা গরীব মানুষকে, ক্ষুৎকাতর মুসল্লিকে বেহেস্তের লোভ দেখিয়ে বক্তৃতায় ফি আদায় করে নিত ।"* (৩৩)

লেখক স্কুলে যা শিক্ষা পেয়েছিলেন তাতেই তাঁর মনে দেখা দিত এইসব প্রশ্ন --

> *"মুসলমানের একাধিক বিয়ের দরকার কেন হয়, তার সত্তরটি হুরি লাগে কেন ? বিবি তালাকে মুসলমানের এত কেন মস্তি ? এরা এত গরীব কেন ? ..... এই সমাজে একজন ডাক্তার নেই, ইঞ্জিনিয়ার নেই, বিজ্ঞানী নেই, গায়ক-গায়িকা নেই, কোনো অভিনেতা-অভিনেত্রী নেই, চিত্রকর-ভাস্কর নেই । শুধু পাড়ায়-পাড়ায় মৌলবি-মাওলানা-খাতিব-হাফেজ-ক্বারী-মোয়াজ্জিনে ভর্তি । গরুর সিমলাই (জোয়ালের ছিদ্রে এঁটে দেওয়া গোঁজা লাঠি) দিয়ে এই সমাজে বউ-মারার রেওয়াজ, কী অদ্ভুতই বটে । বিচিত্র অদ্ভুত এই বাংলার মুসলমান সমাজ ।"* (৩৪)

ঔপন্যাসিক এই পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার কারণই যেন তুলে ধরলেন 'ফুলবউ' উপন্যাসে । তিনি লক্ষ করেন 'কুরআনে' এত সুন্দর কবিত্বের ছড়াছড়ি, তার

ধারেকাছে না গিয়ে মৌলবী সাহেবরা শুধু হুর আর বেহেস্ত নিয়ে পড়ে থাকে । তিনি 'কুরআনের' সূরা 'লাইল' (রাত্রি) এর সৌন্দর্যবোধ থেকেই লেখেন এই উপন্যাস ।

ঔপন্যাসিক যেমন মুসলিম সমাজের এই অবস্থা থেকে পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছেন তেমনি উপন্যাসের নায়ক মিল্লাতও বাবার শরিফী কর্মকান্ড দেখে গ্রাম ছেড়ে চিরকালের মত পালিয়ে বাঁচতে চাইল । বাবা নিসার হোসেন নবীর সুন্নত পালনের জন্য ঘরে তিনটি বউ থাকলেও আবার বিয়ে করতে চায় । সে ধনী মানুষ । তাই সে চায় ইসলাম ধর্মের সমস্ত কাজ ঠিকঠাক পালনের । তবে সবই ছিল তার লোক দেখানো, সে ইসলামের অন্য কয়টি কাজ করে মানুষের এবং পরিবারের মুখ বন্ধ করত কৌশলে যাতে তার মনের ইচ্ছা মেটাতে কেউ বাধা না দেয় । কিন্তু মিল্লাত একমাত্র শিক্ষিত ছেলে এবং নবীনা কিছুটা শিক্ষিত মেয়ে । অন্যরা বিয়ের বিরোধী শুধুমাত্র সম্পত্তির ভাগ কম পাবে বলে । এই অবস্থা থেকে মিল্লাত পালাতে চেয়েছে । শরিফী কার্যকলাপ তাকে যেন পিষে মারছে --

> *"মিল্লাত অত্যন্ত বিচলিত হয়েই বারবার এই নিশ্ছিদ্র অশ্লীল ঘটনার চৌবাচ্চা থেকে নিষ্ক্রমণের পথ খুঁজছিল । কিন্তু সদ্য সে পথ নিরেট পাষাণে বন্দী । কোথাও সামান্য ছিদ্রও চোখে পরে না ।"* (৩৫)

বাবা নিসার হোসেনের যখনই যার উপর নজর পড়েছে তখনই তাকে বিয়ে করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে । বর্তমানে তার চোখ পড়েছে সুন্দরী শিক্ষিত রাজিয়ার উপর, যাকে নিসারের মা মিল্লাতের বউ করার জন্য ঠিক করে রেখেছে । ছেলের জন্য ঠিক করা মেয়েকে বিয়ে করতে চায় নিসার । এখানে রাজা ইডিপাসের কাহিনি মনে পড়ে যায় ইডিপাসে ছেলে বাবার বউকে বিয়ে করার জন্য যুদ্ধ করে এবং শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়ে বিয়ে করে । আর এখানে বাবা যুদ্ধ করে ছেলের বউকে বিয়ে করে । এই ঘটনায় মিল্লাতের কাছে বাবার কাজ ক্ষমা বা ঘৃণা করার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না । তাকে জবাবদিহি করতে হয় সভ্যতার কাছে, এই জন্য তার নিজেকে মুসলমান পরিচয় দিতে কষ্ট হয় এবং বাবার আদর্শ নিয়ে মনে ক্ষোভ হয় --

"নিজেকে মুসলমান বলতে আমার খুবই কষ্ট হয় । কারণ প্রশ্নটা তো আমি নিজেই করি, আমার বাপ কি আইডিয়াল ছিল ? আদর্শ মুসলিম ছিল ?" (৩৬)

বন্ধু মবিন বলে --

"হ্যা, অনেকখানি ছিলেন, - কিন্তু এসবই ছিল তার বাইরের চিহ্ন ।" (৩৭)

এইভাবে নিসার যে বহিরঙ্গ তৈরি করেছিল তাতে সবাই মনে করত, সে নিতান্তই ধর্ম পালনের জন্য এই বিয়েগুলি করেন । তাতে স্ত্রীরাও বাধা দেয়নি । তারা ভালো করেই জানে স্বামীর ধর্মের কাজে বাধা দিলে কোথাই তাদের ঠাঁই হবে । ফলে নিসার নিজের চতুর্থ বিয়ের ইচ্ছা মাবুদকে দিয়ে বড় গিন্নির কাছে পাঠাল --

"কারণ আরো দুটো বিবাহ তিনি এই ভাবেই প্রথমা পত্নীর স্বীকৃতি নিয়েই সম্পন্ন করেছেন । এ-ক্ষেত্রে না করার মত সাহস প্রথমা পত্নীর নেই । কখনও কোনো পত্নীরই কি থাকে ? নবীর সুন্নতে হস্তক্ষেপ করার ধর্ম-বিরুদ্ধ মনস্কামনা থাকতে নেই কুত্রাপি ।" (৩৮)

বাড়ির অন্যান্যদের এই খবর তেমন খারাপ না লাগলেও নাইন পাশ নবীনার খারাপ লাগে, এবং শিক্ষিত মিল্লাতই একমাত্র বোঝে নবীনার কথা । এই নবীনাই এগিয়ে এসে বাবার কাছে জবাব চায় কেন সে আবার বিয়ে করবে । নবীনা বাবাকে অনেক যুক্তি দেখায় যাতে বাবা বিয়ে না করে, পাল্টা যুক্তি দেখায় নিসার । নবীনা বাবাকে বলে --

"আপনি এভাবে বিয়ে করতে চাইছেন কেন ? নবীর সব সুন্নতই কি আপনি পালন করেছেন ? নিসার হোসেন গম্ভীর হয়ে উত্তর করলেন, করেছি বৈকি । তোমার কি সন্দেহ হয় ? নবীনা বলল, শ্রমিককে তার গায়ের ঘাম শুকিয়ে যাওয়র আগেই পারিশ্রমিক মিটিয়ে দেওয়ার কথা । হজরতের নির্দেশ । আপনি তা করেছেন ? .....

প্রতিবেশী উপোসে থাকলে হাদিসে আছে নামাজ কায়েম হয় না, মাবুদ তো পর নয় । প্রতিবেশীর চেয়ে অনেক নিকট । ওষুধের ওভাবে তার ছানাপোনা চোখের সামনেই মরছে বছর বছর । কাফিনের দামটুকু দিলেই কি সুন্নত হয় ?" (৩৯)

নবীনার সঙ্গে যুক্তি-তর্কে না পেরে নিসার আবার ধর্ম নামক অস্ত্রকে হাতিয়ার করে । সে হাদিসের গল্প তুলে ধরে তাকে থামাতে চাইল --

"তুমি তর্ক করো না । মা ফতেমা কখনও রছুলের সঙ্গে এভাবে তর্ক করতেন না ।" (৪০)

নিসার নিজেকে হযরত মহাম্মদের আসনে বসিয়ে দিয়ে বিয়ের গতি বাড়াতে চাইল । সে শুধু লক্ষ করেছে ফতেমা তর্ক করেনি, কিন্তু লক্ষ করেনি কেন তর্ক করেনি । এখানে নবীনার তর্ক করার যথেষ্ট কারণ আছে তাই সে জিজ্ঞাসা করে সে কোন যুক্তিতে বিয়ে করবে । কিন্তু নিসার অটল, তারও মনে হয় নবীনারা কোন যুক্তিতে বাধা দিতে চায় । নবীনা বাবাকে জানায় --

"এযুগে চারটি বিয়ে কিছুতেই চলে না । একা একটি মানুষ চার চারটি মনকে সন্তুষ্ট করতে পারে না । যেটা অসম্ভব ।" (৪১)

শিক্ষিত নবীনা ভালোই বোঝে বর্তমান সময়ে একটি মনকেই মানুষ বুঝতে পারে না চারটিকে বুঝবে কি করে । কিন্তু নিসার এতেও দমার পাত্র নয় । সে পৃথিবীর সব ধর্ম ও জাতের একাধিক বিয়ের কথা তুলে ধরে এবং নিজের মনের কথা মেয়েকে জানিয়ে দেয় --

"আমার মন তো চারটে বিয়েই চায় । সেই বিয়েতে যে-মেয়ের কষ্ট হয় না, নবীর কৃপায় তেমন মেয়ের আকাল হয়নি । শিক্ষিত মেয়ে মানেই সব মন তোমাদের মতন কাঁদুনি করা ছোট মন নয় । মন ভরানোর চেয়ে আমার সমাজে পেট ভরানোর ক্রাইসিসটাই বেশী ভয়ানক ।" (৪২)

বারবার নিশার আলি নবী আর ফতেমার বা নবীর বিভিন্ন হাদীসের কথা উল্লেখ করে নিজের দোষ ঢাকতে চাইছে । কিন্তু আমরা সবাই জানি নবী কোনো প্রেক্ষিত ছাড়া কোনো কাজ করেননি । নবী যে যে পরিপ্রেক্ষিতে এই সব কাজ করেছিলেন সেগুলো একেবারেই ভিন্ন বা তা হওয়াই ঠিক ছিল বলেই ফতেমা তর্ক করেনি । কিন্তু নিসারের প্রেক্ষিত একেবারেই আলাদা । সে ধর্মের নাম করে তার মনের সুড়সুড়ি মেটাতে চাইছে, তাই এখানে নবী ও ফতেমার কথা খাটে না, তাই নবীনা বলে --

> *"ফতেমা তর্ক করেননি, আমরাও করব না । ঠিক আছে । কিন্তু নবীও তাঁর মেয়ে ফতেমার কাছে যুক্তি চাইতেন । আপনি পাঁচ রকম সমাজের কথা বলেছেন, সে-সমাজে এত চাষা বাস করে না, সে-সমাজ আমার নয় । আমার সমাজের কথা বলুন । আপনি ইন্টারমিডিয়েট, ফার্সীতে এককালে কবিতা লিখতেন, কিন্তু আপনার ঘরে একটি জাহানারা নেই । ছেলেরা সবাই মূর্খ । গরুর দোস্ত । সেই সমাজে মন বলে কোনো বস্তু আছে নাকি ? ..... আমার সমাজে যা চলে না, তাই চালাতে যাবেন না । আপনি আমার বর্তমান তিন মায়ের মুখের দিকে চেয়ে দেখেছেন কখনও ?"* (৪৩)

কিন্তু পেছনে হটতে নারাজ নিসার । সে যেভাবেই হোক না কেন, সে যে চতুর্থ বিয়ে করার যোগ্য তা প্রমাণ করতে আদা-জল খেয়ে লেগেছে । বর্বর আরবে যখন বিভিন্ন যুদ্ধে প্রচুর পরিমাণে মানুষ মারা যেত তখন তাদের ছেলে-মেয়েরা এতিম হয়ে যেত । এই এতিমদের যদি কেউ সম্মানের সহিত বউ-এর মর্যদা দিয়ে ঘরে নিতে পারত এবং তার জন্য যদি অন্য বউয়ের অভিযোগ না থাকত তবেই বিয়ে করতে পারত । কিন্তু নিসার এই ঘটনার সাথে তাল মেলাতে চায় পশ্চিমবাংলায় এবং সেই ছয়ের শতকে ফিরে যেতে চায় । ফলে সে যুক্তি দেখায় --

> *"তখন চার বিয়ে তো বাধ্য হয়েই চালু হয় । চার কেন, চৌদ্দ বিয়েতেও কোনো আপত্তি ছিল না । শিক্ষিত ছেলে চাকুরি পায় না । বেকার । ওয়াগন ব্রেক করে । মুনিশ খাটতেও পারে না । পকেট*

মেরে খায় । সবই তো মুর্দা মাগো । আমার সাধ্য আছে ভরণের পোষণের । শক্তি সামর্থ্য আছে । আমাকে ভ্যাসাকটমি করাতে হয় না । আমি কেন নারাজ হই নবীর সুন্নতে ?" (৪৪)

শেষপর্যন্ত যুক্তিবাদী মননের কাছে হার মানে নিসার । সে মেয়েকে আশ্বস্ত করে বলে সে বিয়ে করবে না । কিন্তু ছলনাকারীর ছলনার অভাব হয় না । সে যখন দেখল রাজিয়ার সাথে বিয়ে বলেই এত সমস্যা তখন সে পাত্রী বদল করে ফেলে । সে বাড়ির গরীব চাকর মাবুদকে জমির লোভ দেখিয়ে বউকে তালাক দিতে বলে । তালাক হলেই সে বিয়ে করবে । কিন্তু এতেও যখন সবাই আপত্তি তোলে তখন সে রাজিয়ার ভাইদের টাকা দিয়ে হঠাৎ রাজি করিয়ে ফেলে । কিন্তু এই বিয়েতে মত ছিল না রাজিয়ার । আমাদের সমাজে মেয়ে মানুষ রাজি না হলে কার কি এসে যায় । ফলে রাজিয়ার সে সময় কিছু করার ছিল না । কিন্তু বাসরঘরে সে বুড়ো নিসারকে তার শরীর ছুঁতে দেয়নি । বুড়ো মনের ক্ষিদা মেটাতে চেষ্টা করেও সফল না হলে রাজিয়ার হাত পুড়িয়ে দেয় এবং মনের ক্ষিদা নিয়ে মারা যাবার সময়ও তাকে মাফ করেনি । মৃত্যুকালে রাজিয়া তার কাছে তালাক চাইলে সে বলে --

"খালাস নাই । দিব না মুই । না রে নাঃ দিব না । সেই রাতে যা দিলিনে মালকিন, সেই ভুখ নিয়ে মরলাম, আল্লাজী তোর কসুর যেন মাফ না দ্যান, এই মোনাজাত । পুলসেরাত তোকে কে পার করে, দেখব একবার । তুই খালাস পাবি না ।" (৪৫)

ধর্মের মুখোশধারী ভণ্ড মরতে মরতেও ভয় দেখায় ধর্মের । কিন্তু সে যে সমস্ত কাজই চোরা পথে করেছে তাকে কে পুলসেরাত (স্বর্গের রাস্তা) পার করবে সেটা সে বিচার করে না । যদিও রাজিয়ার সাথে নাসিরের কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি তবুও রাজিয়ার সাথে মিল্লাতের বিয়ে দিতে পারে না এই সমাজ । কারণ মুসলিম সমাজের কাছে কলেমা বা 'কুরআনের' জোর অনেক বেশি --

"শুধু একটা কলেমার কী জোর ! কোরানের আয়াত কী অসম্ভব শক্তিশালী ।" (৪৬)

অর্থাৎ মুসলিম সমাজ যেটা বুঝেছে তাই ঠিক । তাদের কাছে সমাজই বড় কথা । রাজিয়ার ভাইয়েরা যে নিসারের কাছ থেকে জোর করে তালাকও করিয়ে নেয় সেই তালাকনামারও কোনো দাম থাকে না । মুসলিম সমাজের কাছে কোর্টের বা কাগজের কোনো দাম নেই তারা মুখের উচ্চারণেই বিশ্বাস করে এবং তা খুব সহজেই করে সমাজে নিজেদের স্থান স্পষ্ট করে দেয় । তাদের কাছে নিসার আজ বুড়ো থাকলেও বেহেস্তে তো বাইশ বছরের যুবক হবে । ফলে আজ যদি রাজিয়া সুখ নাও পেত কিন্তু পরকালে তো পেত । মুখোশধারীর আকর বলে --

"একটি কচি কিশোরী চঞ্চল পাখির মতন বৃদ্ধের চোখের সামনে খেলা করে ফিরছে, সেই উদ্দীপনা কি তুচ্ছ হতে পারে ? বয়স নিয়ে টানাটানি করছেন, কিন্তু বেহেশতে গিয়ে সেই বুড়োই তো বাইশ বছরের যুবা হবে, সেই যৌবনই তো অনন্ত ভাই রে ! হজরত আয়েশা সেই কথা জানতেন বলেই নবীকে ভালবাসতে পেরেছিলেন ।" (৪৭)

এই মৌলবীরা কেউ রাজিয়া এবং মিল্লাতের বিয়ে পড়াতে আসেনি । ফলে রিয়াজ এবং নবীনা অনেক চেষ্টা করেও হেরে যায় ।

শুধু রাজিয়া মিল্লাতই নয়, নবীনার জীবনেও ঘটেছে মর্মান্তিক বিচ্ছেদ । স্বামী তাকে না জানিয়ে আর একটা বিয়ে করে সেখানেই থেকে গেছে । সে চাইলেও আর একটা বিয়ে করতে পারে না । কারণ মুসলিম সমাজে নারীকে পুরুষ তালাক না দিলে সে তালাক পায় না । কিন্তু এই নিয়ম যে পুরুষতন্ত্রের তৈরি তা বুঝতে অসুবিধা হয় না, নবীনার কথায় পরিষ্কার হয়ে যায় --

"উপায় আর কী ? মেয়েদের নসিব তো খোদা বানায় না । মানুষ তৈরি করে । সেই বরাত খোদা পুরুষকে দিয়েছেন । তোমরা সব পারো ।

তোমাদের ইমান খেলা দেখে মনে হয় খোদার লীলা তো পুরুষেরই হাতে । খোদা একটা পুতুল । তোমরাই বাজিকর ।" (৪৮)

ফলে শেষ পর্যন্ত স্বেচ্ছায় পৃথিবী থেকে চলে যেতে হয় নবীনাকে । এদিকে মবিন যে ধার্মিক । সে ধর্মের দোহাই দিয়ে বিয়ে আটকেছে মিল্লাত-রাজিয়ার । কিন্তু সে নিজে অনেক অধর্মের কাজ করেছে নবীনার সাথে এবং শেষ পর্যন্ত রাজিয়াকেও সে ছাড়েনি । এই অধর্মের কাজের সময় মবিনের ধর্মবোধ কাজ করে না ।

এই উপন্যাসে কতগুলো হাদীস তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক । এই হাদীসগুলো সহীহ্ হাদীস । অর্থাৎ যে হাদীসে কোনো সন্দেহ নেই । যেমন -- স্বামীর পায়ের নীচে স্ত্রীর জান্নাত, সুন্দরী বউ বিয়ে করা প্রভৃতি । এই হাদীসগুলো কীভাবে আমাদের সমাজ ভুল পরিপ্রেক্ষিতে তুলে ধরে তারই নমুনা তুলে ধরেন লেখক এখানে । স্বামীর পায়ের নীচে স্ত্রীর জান্নাত একদম ঠিক, তবে সেই স্বামীকে স্বভাবে, চরিত্রে, ব্যবহারে জান্নাত হতে হবে, মানে নিজেকে জান্নাতের মতো পবিত্র করে তুলতে হবে তবেই সেই জান্নাতে স্ত্রীর স্থান । নিজে কোনো নিয়ম না মেনে, ভণ্ডামি করে, স্ত্রীর অধিকার সম্পর্কে কোনো জ্ঞান না রেখে, শুধু নিজের অধিকারের সময় হাদীস আওড়ানো স্বার্থপরের কাজ । কিন্তু মুসলিম সমাজের স্বার্থপর মানুষগুলো কীভাবে নিজের সুবিধার সময় হাদীস ও 'কুরআনের' কথা তুলে ধরে সুবিধাভোগ করে এবং অন্যের সময় তার ধারে কাছেও যায় না তার এক নিদারুণ চিত্র তুলে ধরেছেন নিসার, মবিন, আকবর প্রভৃতি চরিত্রের মাধ্যমে । অন্যদিকে এদের সাথে লড়াই করে যায় রাজিয়া, মিল্লাত, রিয়াজ, নবীনারা । সমালোচকের মতে --

"নিসার হোসেনের মতো লোকেরা নবীর সমাজের সমর্থনে, ইসলামি আইনের জোরে একালে বসেও চার স্ত্রী রাখতে পারে । আর ধর্মের চাবুকে তার সমর্থনও আদায় করে নেয় অন্য স্ত্রীর কাছ থেকে, কিন্তু ইসলামি আইনের এমন কদর্য প্রয়োগের সঙ্গে আপস করতে পারে না সভ্য সচেতন মনগুলি । তাই সারা উপন্যাস জুড়ে লড়াই চলে ধর্মের মুখোশধারী স্বার্থসিধধিকারীদের সঙ্গে যুক্তিবাদীদের।" (৪৯)

নারীকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়ে আবুল বাশার 'ফুলবউ' উপন্যাসে রাজিয়াকে দাঁড় করাতে চেয়েছেন । কিন্তু রিয়াজ ও মিল্লাত পারে না সমাজের এই কাঁটাতারকে ছিন্ন করে নারী-সমাজের প্রতিনিধি রাজিয়া ও নবীনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে । এই না পারার আত্মগ্লানি যেন লেখককে আরও সুকৌশলী করে তোলে । রাজিয়ার মাধ্যমে যে স্বপ্ন লেখক পূরণ করতে পারেননি, তাই যেন পূরণ করতে চেয়েছেন তাঁর *'ধর্মের গ্রহণ'* (১৯৯২) উপন্যাসের নারী চরিত্র সৈয়দা নাজনিনের মধ্য দিয়ে । উপন্যাসটির প্রচ্ছদে যথার্থই বলা হয়েছে --

> *"লেখকের 'ফুলবউ' উপন্যাসেরই যেন অপরপিঠ এই 'ধর্মের গ্রহণ' ।"* (৫০)

'ধর্মের গ্রহণ' উপন্যাসে সৈয়দা নাজনিন দশ পারার হাফেজ ও শিক্ষিত অতি সুন্দরী রমণী । তার বিবাহ হাফেজ সলিমউল্লাহের সাথে হওয়ার কথাবার্তা চলতে থাকলেও একলাস মুনশী ওরফে তামাদি মুনশীর কূটনৈতিকতায় সম্পত্তি লাভের আশায় নাজনিনের বিয়ে হয় তামাদির নাতি বেলালের সাথে যে কিনা নাজনিনের সম্পূর্ণ উল্টো প্রকৃতির । বেলাল অর্থনীতিতে অনার্সের ছাত্র । নাজনিন দশ পারার হাফেজ হলেও বেলাল 'কুরআন' পাঠও জানত না, নামাজ পড়ে না, রোজাও করে না ; ব্যস্ত থাকতে ভালোবাসে কবিতা আবৃত্তি নিয়ে । নাজনিনের মামা মোতালেব চৌধুরি এ বিয়ে নিয়ে কঠোর আপত্তি জানিয়ে সলিমউল্লাহকে তার যোগ্য পাত্র মনে করে বলে --

> *"সলিমউল্লাহ তিরিশ পারার হাফেজ ! কোরানের উপর কোরান রাখা যায় – তাই বৈধ । এ বিয়ে ভুল !"* (৫১)

ধর্মীয় গোঁড়ামিকে এখানে ঔপন্যাসিক সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন । গোঁড়া মুসলিম সমাজের প্রতিনিধি মোতালেবের মতে যেহেতু বেলাল ধর্মের কথায় ওঠা-বসা করে না তাই তাকে ধার্মিক, 'জীবন্ত কোরান' নাজনিনের ওপর রাখা যায় না । বেলাল রুচিশীল উন্নত চিত্ত পুরুষ । সাহিত্য তার সাধনা । জীবনকে সে তথাকথিত ধর্মবোধের

বেড়াজালের অনেক উপরে নিয়ে যেতে চায় । কিন্তু সমস্ত আপত্তি হার মানে নাজনিনের জেদের কাছে এবং ধর্ম-অধর্মের বিয়ে হয়ে যায় ।

কিন্তু ধর্মসম্মত বিয়ে হলেও দুটি মনের মিলন হল না । বেলালের মনে সন্দেহ জাগে ফুলশয্যা পীড়িত ওই স্ত্রী কি তার ? তাই তাকে স্পর্শ করে এর উত্তর পেতে চায় বেলাল । কিন্তু স্পর্শ করতে যেতেই নিজেকে সরিয়ে নিয়ে আত্মঅহংকারী ধার্মিক নাজনিন বলে --

> *"ওজু করে তবে আমাকে স্পর্শ করবেন ! ..... আপনাকে নামাজ আর কোরান পড়া অভ্যাস করতে হবে ।"* (৫২)

কিন্তু এমন শর্তের জীবন চায়নি বেলাল । নিজের মনে ক্ষত-বিক্ষত হয় সে । দশপারা নাজনিনকে দিয়েছে ধর্মমর্যদা, আত্মঅহংকার, যে অহংকার বোঝে না বেলালের সাহিত্যিক মনুষ্যত্ব যা দিয়ে বেলাল ধর্মের চেয়ে জীবনকে বড় করে দেখেছে । ধার্মিক নাজনিনের চোখে অধার্মিক বেলাল অযোগ্য, যদিও সে নোংরা ছিল না । কিন্তু বেলাল এই অপমানের প্রতিশোধ নেয় ধর্ম দিয়ে নয়, স্বামীত্বের জোরে, পুরুষশক্তির জোরে ; ধর্ষিত হয় 'জীবন্ত কোরান' নাজনিন --

> *"ওর দেহের একভাগ পড়ে থাকে নামাজের আসনে, ... নাজনিনকে পুরোপুরি নগ্ন না করা পর্যন্ত বেলালের অপমান প্রশমিত হয় না, কাম আর ক্রোধ যেন বজ্রবৎ নাজনিনের সকল সম্ভ্রম চিরে ফেলে । দু'হাতে মুখ ঢাকে নাজনিন । তারপর সে ধর্ষিত হয় ।"* (৫৩)

নাজনিন ধর্মের জোরে আত্মঅহংকারী হয়ে উঠলেও শিক্ষিত বেলাল প্রতিশোধের জ্বালায় নাজনিনকে না বোঝার চেষ্টা করে পুরুষত্বের জোরে, কলেমার জোরে ধর্ষন করে নিজের স্ত্রীকে যা ধর্মের চোখে অন্যায় না । বিধর্মী বেলালও ধর্মকে হাতিয়ার করে অত্যাচার চালায় নাজনিনের ওপর । সমালোচকের মতে --

"বিয়ের পরেই শুরু হয়েছে জীবন আর ধর্মের সংঘর্ষ । ..... নাজনিনের শুদ্ধতার গোপন ঘাতক হয়ে নির্জন দুপুরে সে জোর করে তার সঙ্গে মিলিত হয় ।" (৫৪)

ধর্ম ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার । কিন্তু যেই ধর্মের জোরে নাজনিন বেলালকে স্পর্শ করতে মানা করে, সেই ধর্মকেই ব্যবহার করে বে-দ্বীন বেলাল রক্তাক্ত করে তোলে জায়নামাজকে, ধর্মকে । জীবনতন্ত্রের প্রতিনিধি বেলাল আত্মমর্যদাশীল হলেও অর্থের অভাবে নাজনিনের কথা অনুযায়ী সে নামাজ-কালাম করতে থাকে । কিন্তু সৈয়দার তার প্রতি হীনদৃষ্টি ও নাজনিনের প্রতি সলিমউল্লাহের ব্যবহার ভাবিয়ে তোলে বেলালকে । তাই সে এই সন্দেহের প্রতিবাদে 'কুরআনের' বদলে 'সঞ্চিতা' পড়ে । তালাক দিতে চায় সে নাজনিনকে ।

যখনই ধর্ম বেলালের পায়ে বেড়ি পরাতে চেয়েছে, তখনই বাড়িছাড়া হয়েছে সে । কিন্তু চুম্বকের বিপরীত মেরু যেমন পরস্পরকে আকর্ষণ করে ঠিক একইভাবে ধর্মের এক মেরু বেলাল যেন ধর্মের টানেই আকর্ষিত হয় বিপরীত মেরু নাজনিনের প্রতি । ভালোবেসে ফেলে সে নাজনিনকে । কিন্তু পরমুহূর্তে সে আবার ভাবে যদি নাজনিন এত পবিত্র যে তাকে স্পর্শ করতে 'ওজু' করতে হয় তবে কেন সে তাকে স্পর্শ করতে দেয় সলিমউল্লাহকে ? কেন সলিম অন্ধকারে ভাঙবে নাজনিনের চুড়ি ? তখন কোথায় থাকে তাদের হাফেজী ধর্মবোধ ? --

"যার মনে এত শুদ্ধতার অনুভূতি, সে কেন সলিমউল্লাহকে দেহ স্পর্শ করতে দিলে ? তার হাতের চুড়ি ভাঙল কী করে ? সলিমের ওভাবে রক্তপাত হয়েছে কেন ? রুধির কি সহজে ঝরে ?" (৫৫)

তবে কি ভালোবাসা ধর্মের উর্ধ্বে ? যদি না হয় তবে দশপারার হাফেজ নাজনিন কীভাবে পরপুরুষ হাফেজ সলিমউল্লাহকে স্পর্শ করতে দেয় ? অর্থাৎ যারা কথায় কথায় ধর্ম দেখায়, তাদের এই ধর্মবোধ নিজের ক্ষেত্রে কাজ করে না, কাজ করে শুধু

বেলালের ক্ষেত্রে । ধর্মের ধ্বজাধারী ভণ্ড ধার্মিকরা এভাবেই নিজেদের মত করে তৈরি করে নেয় ধর্মকে যা নিজের পায়ে কখনোই বেড়ি পরায় না, বেড়ি পরায় সমাজের পায়ে ।

বিধর্মী রুচিশীল বেলাল নাজনিনকে ভালবাসলেও তাকে সলিমউল্লাহের হাতে তুলে দিতে চায় । কারণ ধর্ম বেলালকে পেতে দেবে না নাজনিনকে । বেলালের কথায় --

> *"ধর্ম নাজকে আলাদা সৌন্দর্য দিয়েছে । মন তার পবিত্র । ... আমার বাস্তবতা আমার রক্তমাংসে, আমি কোন মানবীকে বিয়ে করিনি – কতগুলো আচার আর ধর্মবোধকে না মানলে যখন তাকে পাওয়া সম্ভব নয়, ... আমার বাপ অত দরিদ্র না হলে, আমি নাজনিনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাকে সলিমউল্লাহর হাতে তুলে দিতাম ।"* (৫৬)

টিপুকে লেখা চিঠিতে বেলালের উদারতা দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে নাজ । বেলালের আত্মত্যাগে যেন ভালবাসার একফালি রোদ উঁকি দেয় নাজনিনের মনে । ঠুনকো ধর্মবোধের ধোঁয়াশা আসন থেকে যেন এক-পা নেমে আসে হাফেজ সৈয়দা নাজনিন । তাই হয়ত সে রোজার দিনেও রোজা না করা স্বামীকে নানীর অমতে গিয়ে অভুক্ত স্বামীকে খেতে দেয় ।

কিন্তু বেলালের ঔদ্ধত্বকে সহ্য করতে না পেরে নানীর সাথে নশিপুর যায় নাজ । ২৭শে রমজান ক্ষুধার্ত বেলাল ছুটে আসে নাজনিনের কাছে একটু শান্তির আশায় । নানী মীরার চোখে বেলালের জন্য ঘৃণা থাকলেও নাজনিন তাকে আপন করে নেয় । 'কুরআন' নাজেল (অবতীর্ণ) হওয়ার সেই রাতে নাজ কাছে পেতে চায় স্বামী বেলালকে । কিন্তু নিজের অক্ষমতা সম্পর্কে সদা সতর্ক থাকে বেলাল --

> *"তোমার পবিত্রতাকে আমি জয় করতে পারব না নাজ । আমার স্পর্শে তুমি বারবার কলুষিত হবে । আমাকে মুক্তি দাও ..... ধর্ম তোমায় গ্রহণ করেছে । আমি তোমাকে কি সত্যিই পাব কখনও ?"* (৫৭)

ধীরে ধীরে নাজনিনের চোখ থেকে ধর্মের কালো চশমা খুলে যায় এবং সে ভালবাসতে থাকে বেলালকে । সে বেলালের জন্য উপহার স্বরূপ লুঙ্গি-গেঞ্জি কিনেছে । কিন্তু নানী বেলালকে নাজের উপহারের যোগ্য মনে করে না । তাই সেই উপহার দিয়ে দেয় সলিমকে । এই ঘটনায় প্রথম বার নাজ নানীর বিপরীত মেরুতে দঁড়িয়ে কথা বলে --

> *"এক নিয়তের খাবার অন্যে দিতে মানা, পোশাক কী করে দিলে তুমি ?"* (৫৮)

ভালোবাসে সে বেলালকে । নাজনিনের কথায় --

> *"আমি তোমাকে বুঝি লাল মুনশী । তোমাকে না পেলে আমি বাঁচব না । আমি আসছি ।"* (৫৯)

ধর্ম-অধর্ম যখনই কাছে আসতে চেয়েছে তখনই স্বার্থপর ধর্মের ক্ষয়িষ্ণু নীতি নিয়ে হাজির হয়েছে নানীমা --

> *"স্বামী সংসর্গে থাকলে আজ এই রাতও তোমার কাছে হারাম হয়ে যাবে নাজনিন । সবেকদর খোদার সঙ্গে যোগ হওয়ার রাত । তুমি আবার পাপ করতে চলেছ ।"* (৬০)

কিন্তু নাজনিনের অপেক্ষায় রাত কাটে না বেলালের । ছাদ থেকে নীচে গিয়ে সে শোনে নাজ ও সলিমের এক সুরে 'কুরআন' পাঠ । তার মনে হয় নাজ ও সলিম একে অপরের জন্য তৈরি । তাই সেই ভোরেই নামাজের পর বেলাল সলিমকে বলে --

> *"আপনারা একই সুরে বাঁধা । গলা তো আপনিই মেলে না । সুর মিললে তবেই মেলে । আপনাদের বিচ্ছিন্ন করা পাপ । ..... এই জায়নামাজে বসেই আমি নাজনিনকে তালাক দিতে চাই ।"* (৬১)

আবার একবার 'কুরআন' দূরে সরিয়েছে নাজ-বেলালকে । যে বেলাল কোনদিনই মন থেকে ধর্মকে মেনে নিতে পারেনি, যার কাছে ধর্ম একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার, সেই

আবার ধর্মকে হাতিয়ার করে ধর্মের পাখায় ভর করে আওড়ায় 'কুরআনের' সেই কঠোর তিনটি শব্দ --

"বেলাল তিন বার তালাক উচ্চারণ করল ।" (৬২)

নাজনিনের কাতরোক্তি শোনার প্রয়োজন মনে করেনি ধর্মের অপব্যাবহারকারী বেলাল --

"এভাবে হত্যা করো না আমাকে ।" (৬৩)

বিধর্মী বেলাল তার সমস্ত সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গিকে বিসর্জন দিয়ে পুরুষতন্ত্রের জোরে নারীর মতামত না জেনেই 'তালাক' শব্দের মাধ্যমে প্রমাণ করতে চায় যে নাজনিন তারই স্ত্রী --

"এই তালাকের দ্বারা প্রমাণ হবে নাজনিন, তুমি আমারই ছিলে । আমি বিচ্ছেদ ঘটিয়ে বোঝাতে চায়, তুমি আমার, আর কারো নও ।" (৬৪)

সমালোচকের মতে --

"যে ঈশ্বর মানে না, ধর্মাচরণে আস্থা নেই, কেবল চাপে পড়ে ধর্মাচারণের ভণ্ডামি করে তার কাছে তালাক শব্দের প্রয়োগ আশা করা যায় না । কিন্তু নারীকে দমন করার সুযোগ ইসলামি আইন মুসলিম পুরুষদের হাতে অর্পন করেছে (নারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার মূল্য সেখানে নেই) বেলালের মত রুচিশীল পুরুষরাও প্রয়োজন মতে কখনো সেই আইন প্রয়োগের হুঙ্কারে, ... নারী মনকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ।" (৬৫)

তিন অক্ষরের একটি শব্দের প্রয়োগ কীভাবে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে নারী জীবনকে রক্তাক্ত করে তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ নাজনিন । ইসলামি পিতৃতন্ত্রে এই শব্দের অর্থ ও প্রয়োগ জানা বা না জানার মধ্যে কোনো বিষয় আটকে থাকে না । ইসলাম তাদের দিয়েছে এই অধিকার । যখনই নারীর কোনো পদক্ষেপ এমনকি নিজের পদক্ষেপও যদি ঠিক

জায়গায় না পড়ে, তবে তার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে নারীর ওপর এবং অকারণে তিন তালাক বলা হয়ে যায় । তাই ঔপন্যাসিক যর্থাথই বলেছেন --

> *"প্রতেক ধর্মই ব্যক্তি-মানুষের মোক্ষের কথা বলে । ..... আমি যে ইসলাম দেখেছি, তা ব্যক্তির কোন কাজে লাগে না, ওটা একান্তই গোঁড়া সম্প্রদায়ের অধিকারে থাকা অনুশাসন, ব্যক্তির উপর ফতোয়া চাপাবার কর্মসূচি ।"* (৬৬)

তাই ধর্মের এই গোঁড়ামি থেকে, ধর্মের অপব্যবহার থেকে ঔপন্যাসিক টেনে বের করে আনতে চেয়েছেন নাজনিনকে । 'ফুলবউ' উপন্যাসে রাজিয়াকে ধর্মের পর্দা সরিয়ে বের করে আনতে না পারলেও, নাজনিনের ক্ষেত্রে ভীত নন লেখক । তিনি ধর্মের চোখে আঙুল দিয়ে ধর্মের সামনে দিয়ে অক্ষত অবস্থায় বের করে আনেন নাজনিনকে মুসলিম সমাজের গতানুগতিক তালাক পদ্ধতি থেকে । তাইতো নাজ সলিমউল্লাহের মাধ্যমে বিয়ে-তালাক পদ্ধতিতে ফিরে আসতে চায় না বেলালের কাছে । নাজনিন জানে যে তার তালাক হয়নি । সে দশ পারার হাফেজ । তালাকের নিয়ম তারও জানা আছে । আর এই উদ্দেশ্যেই হয়ত লেখক নাজনিনকে শিক্ষিত করে 'ধর্মের গ্রহণে' এনেছেন । নাজনিনের কথায় --

> *"আমি আদৌ তালাক হয়েছি কিনা তা-ও বলতে পারি না । ..... একলাসের পোতার সঙ্গে আমার কোন বিচ্ছেদ হয়নি ।"* (৬৭)

সমাজে প্রচলিত ইসলাম ধর্মের নিয়মানুযায়ী নাজনিনের তালাক হলেও সে বেলালকে পেতে চায় ; কিন্তু ইসলামের রীতি অনুযায়ী নয় । নাজের কথায় --

> *"যে কুৎসিত পথে তাকে ফিরতে হবে, অন্যের সঙ্গে বিবাহ, তালাক এবং বিবাহ, এপথ সে মাড়াতে পারবে না । দুটি পুরুষ তাকে লেহন করবে, তা সে পারবে না ।"* (৬৮)

এভাবেই লেখক যেন মুসলিম নারীদের যন্ত্রণা কিছুটা কমাতে চেয়েছেন । তিনি নারীকে পুরুষের কাম চরিতার্থের যন্ত্রে পরিণত হতে দেননি । তাই মুসলিম নারী সমাজের

প্রতিনিধি নাজ নিজেকে দুই পুরুষের লেহনের বস্তুতে পরিণত করতে চায়নি । তাই সলিম নাজকে বিয়ে করতে চাইলে প্রকৃত ধর্মের কণ্ঠ হয়ে মোতালেব চৌধুরি বলে --

> *"সাক্ষী কখনও বর হতে পারে না সলিম, সাক্ষীর নিরপেক্ষতা চাই !*
> *..... বোঝা যায় এই তালাক সাক্ষীসিদ্ধ নয় ।"* (৬৯)

যেহেতু ধর্ম নাজকে গ্রহণ করেছে, ধর্মই যেন আবার বাঁচায় নাজনিনকে । একটি মিথ্যা উচ্চারণ করে নাজকে ছিন্ন করেছে বেলাল । যখনই রাগ উঠেছে তখনই বেলাল নাজনিনকে তালাকের ভয় দেখিয়েছে --

> *"আমি ওকে ত্যাগ করেছি আপনার সামনে । ক্রোধে আমি তখন উন্মত্ত ছিলাম ।"* (৭০)

নাজনিনকে না পেয়ে সলিমও বুঝতে পারে ভালোবাসার গভীরতা । শুধু সুরে সুর মিললেই দুটি জীবন এক হতে পারে না । তাই সে বোঝে --

> *"..... এই বিচ্ছেদ ধর্মসম্মত নয়, এ কেবল হিংসা, ক্রোধ আর ব্যর্থতা বেলালের ।"* (৭১)

এইভাবে সমাজের স্রোতের সম্পূর্ণ প্রতিকূলে গিয়ে সমাজে নারীকে প্রতিষ্ঠা করেন ঔপন্যাসিক, তুলে আনেন পচা-গলা সমাজের আবর্জনার স্তূপ থেকে ইসলামের প্রকৃত সত্যতা । অবশেষে সমাজে প্রচলিত তথাকথিত ধর্ম হার মানে অধর্ম অর্থাৎ প্রকৃত ধর্মের কাছে --

> *"এই রাতে ধর্ম আসে অধর্মের কাছে, বিরল এ রাত্রি অধর্মকে পুরস্কৃত করে ।"* (৭২)

আর এই পুরস্কারের সাক্ষী থাকে ঔপন্যাসিক সহ প্রকৃত ধার্মিক সমাজ ।

মুসলিম সমাজের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আফসার আমেদের *'অন্তঃপুর'* (১৯৯৩) উপন্যাস । সাধারণ মুসলিম পরিবারের নারীদের অন্তরের তথা আঁতের কথা বের করে

পারিবারিক জীবনে তাদের অবস্থানের চিত্র এঁকেছেন লেখক । প্রত্যন্ত এলাকার একটি সাধারণ মুসলিম পরিবারের কাহিনির মাধ্যমে মুসলিম নারী সমাজের করুণ বন্দিদশা সহ স্বাধীনতাহীনতাকে তুলে ধরেছেন । পরিবারের মরিয়ম হল সবচেয়ে বয়স্ক । তার পরিবারকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে উপন্যাসের আদল । তার ছয় ছেলে-ফিরোজ, সিরাজ, রিয়াজ, সাহাদাত, লিয়াকত এবং হাসমত । ছয় ছেলেই রাজমিস্ত্রি, তাদের ছেলেরাও রাজমিস্ত্রি । বাবা বেঁচে না থাকায় সবাই ভিন্ন থাকলেও সংসারের মালিক ফিরোজ, যে মিস্ত্রিতেও বড় এবং মালিক । সবাইকে নিয়ে মালিকানা করে সারাদিন কাজ করে বাড়ি ফিরে আসে । এই পরিবারে নিজেদের মধ্যেই বেশিরভাগ বিয়ে হয়েছে । এক ভাইয়ের ছেলের সাথে অন্য ভাইয়ের মেয়ে, আবার তার ছেলের সাথে তার মেয়ের বিয়ে । বাইরেও বিয়ে হয় তবে সংখ্যায় কম ।

বাড়ির পুরুষ মানুষেরা সারাদিন কাজের জন্য বাইরে থাকে, সন্ধ্যায় সবাই ফিরে আসে । কিন্তু নারীরা সবসময় থাকে বাড়িতেই । তাদের নিজেদের মনের বা মতের কোনো দাম নেই । অবিভাবকরা যা ঠিক করে তাই তারা নিজেদের ইচ্ছাকে মেরে ফেলে পালন করে চলে । অহরহ বাড়ির মেয়েরা বাইরে যেতে পারে না এমনকি আত্মীয় স্বজনদের সাথেও তেমন করে মিশতে পারে না, তাই বাড়িতে যখন কোনো অনুষ্ঠান হয় যেমন বিয়ে বা আকিকা (সাধারণত শিশুর জন্মের সাত দিনের দিন নাম রাখার সময় যে অনুষ্ঠান) বা কেউ মারা গেলে তারা অর্থাৎ আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে মেয়েরা একসাথে হয়ে গলাগলি করে কান্না করে --

> *".....ব্যাক্তিক জীবন তৃষ্ণা তাদের অপূর্ণ থাকে । মনে অশান্তি জমে দিন দিন, ...দারিদ্র, একঘেয়েমিদিন যাপন গোপনে তাদের তৃষিত করে রাখে । পুরুষের বাহির আছে, তাদের নেই । ঘেরাটোপ আছে । তাই তারা কারো মৃত্যু দিনে ছুটে আসে । মিলিত হবার সুযোগও পায় । তারা তখন একে অপরের গলা জড়িয়ে কাঁদে । নিজস্ব অনেক অপূর্ণতার কান্না এসে মেশে বলে এত তারা কাঁদে ।"* (৭৩)

তারা মৃত্যুর দিন যেমন কাঁদে, তেমনটি বিয়ের অনুষ্ঠানে নানারকম অভিনয় করে মজা করে নিজেদের মধ্যে । বাড়ির সমস্ত মহিলারা একসঙ্গে বিয়ের অনুষ্ঠানে বিশেষ করে রাতে তাদের পরাধীনতার জগতেই যেন স্বাধীন হয়ে ওঠে ।

মুসলিম অন্তঃপুরের মেয়েদের যে নিজস্ব বাসনা বা চাহিদার কোনো দাম থাকে না তা আমরা আসমা ও জাহিরাকে দেখে বুঝি । আসমার সবেমাত্র পনেরো-ষোলো বয়স, পড়াশুনা বন্ধ করে বাড়িতেই থাকে । সে মনে মনে পিসির ছেলে সাবিরকে এবং সাবির আসমাকে ভালবেসে ফেলে । কিন্তু বড় চাচা ফিরোজ হঠাৎই বাড়িতে থাকা এক ছুতোর মিস্ত্রি মাসুদের সাথে তার বিয়ে ঠিক করে দেয় । মাসুদ মিস্ত্রির স্ত্রী মারা গেছে, বাপ মরার পর বড় ভাই তাকে সম্পত্তির কিছুই ভাগ না দিলে সে এই পরিবারে এসে স্থান নেয় । সবাই মাসুদকে 'কুটুমভাই' বলে ডাকত, আসমাও । এই পরিবারের সবচেয়ে বড় মেয়ে জাহিরার বিয়ে হয় মইবুর সাথে । মইবু এক বদমেজাজি মানুষ, উঠতে বসতে মদ খেয়ে বউকে পেটায় । এই মার খেয়ে জাহিরা ছেলে মেয়ে ফেলে বাপের বাড়ি চলে আসে এবং কয়েকদিন যেতে না যেতেই মইবু দ্বিতীয় বিয়ে করে বসে এক দরিদ্র মেয়ে হাসিনাকে । জাহিরা রাগের মাথায় বাবার বাড়ি গেলেও কয়েকদিনের মধ্যেই ফিরে আসত নিজের সংসারে কিন্তু মাতাল একটুও অপেক্ষা না করে আর একটা বিয়ে করে বসলে জাহিরা সতিনের সংসারে ফিরে যায়নি । সে মনে প্রচুর আঘাত পায় । একজন নারী নিজের সংসারকে তিল তিল করে গড়ে তোলে নানা পরিশ্রম করে, আধপেট খেয়ে । কিন্তু অকারণে হঠাৎই পুরুষ আর একটি বিয়ে করলেই সে এসে আগের বউয়ের তিল তিল করে গড়ে তোলার সমস্ত জিনিসের অর্ধেক পেয়ে যায় এবং দুঃখের বিষয় আমাদের সমাজের মানুষেরাও এই ভাগে সাহায্য করে । পূর্বের বউ না ভাগ দিলে তাকেই দোষী সাব্যস্ত করে আমাদের সমাজ । এই যন্ত্রণা যেন নরক যন্ত্রণার কম নয় । মরিয়মের কথায় --

> *"আট-দশ বছর সংসার করল, স্বামী বেচে আছে, স্বামী পেল না সংসার পেল না, সতীনের যন্ত্রনা বুকে নিয়ে থাকা এটা একেবারে*

অসহ্য । দুনিয়াতে দোজখ্ যন্ত্রনা । ফিরোজের বড় বেটি জাহিরার নসিবে এই ছিল ?" (৭৪)

এই সংসার ত্যাগী জাহিরা ভরা যৌবন নিয়ে বেড়ায়, অন্য দিকে বউ মরে যাওয়া কুটুমভাই তথা মাসুদও জাহিরার মতই নিজেকে বয়ে নিয়ে বেড়ায় । এক সময় দুজনের মধ্যে গোপন ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যা বাড়ির প্রধান মরিয়মের সজাগ দৃষ্টিকে এড়াতে পারেনি । আসমা ও সাবিরের ঘটনাও জানে মরিয়ম । এই মরিয়ম নিজেও জীবনে অনেক আপোস করেছে । নিজের জীবনে আপোস করতে করতে এটা তার অভ্যাসে পরিণত হয় এবং এই আপোসকেই নিয়ম নীতি বলে মনে করে এবং সুকৌশলে বাকি নারীদের আপোসে সাহায্য করে । অর্থাৎ মরিয়ম পরিবারের প্রধান বা মাথা হিসাবে কোন ঝঞ্ঝাট চায়নি । সে জানে পুরুষের চরিত্র, সে জানে নারীর মন কোনো দিনই বুঝবে না এই পুরুষ, তাই সে বাকিদের সাহায্য করে জীবনের সাথে এবং নিজের সাথে আপোস করতে । মানে সে যেন এক আপোস যন্ত্রে পরিণত হয়েছে । জাহিরার বাবা ফিরোজ যখন আসমার সাথে মাসুদের বিয়ে ঠিক করে তখন জাহিরা ও আসমাকে সুকৌশলে গায়ে হাত বুলিয়ে নিজেদের জীবনের সাথে আপোস করিয়েছে মরিয়ম । আর মাসুদ চেষ্টা করে জাহিরাকে নিয়ে ভাগার কিন্তু জাহিরা নিজের সাথে আপোস করে নিতে চায়নি । তবে বুড়ির উপর রাগ করে আসমার বিয়ের রাতেই সতীনের সংসারে গিয়ে হাজির হয় এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে বুড়ি না মরা পর্যন্ত এ বাড়িতে আর আসবে না । অথচ সে ভেবেছিল মাসুদকে না পেলেও কাছে থেকে দেখতে তো পাবে --

"মাসুদকে জীবনে না পাবার আশাহীনতার ভেতর এইটুকু অবশিষ্ট আকাঙ্খাসাধ সে সর্বস্ব করেছিল । একথা জেনে ফেলে মরিয়ম । এই জানার ভেতর ওবাড়িতে থাকা সম্ভব নয়, বিশেষত মরিয়মের জীবিতাবস্থায় । মরিয়মের চোখ তাকে সারাক্ষণ অনুসরণ করবে । মেয়ে হয়ে আর এক মেয়ের শত্রু সে । .....সেই স্বামীর ঘরেই ফিরে

এসেছে । দাদির মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত সে ওবাড়ি যাবে না, এ কঠিন সংকল্প ।" (৭৫)

জাহিরা যখন সংসারে ফিরে যায় তখন শাশুড়ি-ননদ-সতীন এমনভাবে তার দিকে তাকায় যে সে যেন 'দেখার মত এক জীব' । এসে প্রথম দেখে সতীন হাসিনাকে । সহজ-সরল মেয়ে হাসিনা, সে পোয়াতি । আর স্বামী আরও বদমেজাজি হয়েছে, আগের মতই এই বউকেও উঠতে-বসতে মারধোর করে । একদিন লুঙ্গি না শুকালে নানারকম গালি দিয়ে বলে --

"ঠিক রাগের মাথায় সামনে পড়লে মেরে ভূত ভাগিয়ে দুব । শালি, শালির ঘরের শালি । দাঁড়া, ঘরে থাকি একদিন, মাল খেয়ে এসে তোকে সায়েস্তা করছি ।" (৭৬)

ঠিক কয়েকদিনের মধ্যেই তাই করে মইবু । একদিন তাড়াতাড়ি কাজ থেকে এসে পোয়াতি হাসিনাকে প্রচুর পেটায় । জাহিরা কিছুটা সতীনের প্রতিহিংসাবশত বাধা দিতে যায়নি । এছাড়া সে নিজে সমস্ত সংসারের কাজ নিজের হাতে তুলে স্বামীর সাথে কোনো সম্পর্ক না রেখে শুধু খাটে আর খায়, তাই এই বিষয়ে নাক গলানো তার ঠিক হবে না বলে ঘরে ঝাপ বন্ধ করে থাকে । মইবু ইচ্ছামত পেটায় হাসিনাকে । খুব খারাপ লাগে জাহিরাকে, কেমন মায়া লাগে, জাহিরা জানে যে হাসিনা খুব গরিব ঘরের মেয়ে --

"জাহিরা এইটুকু বোঝে, হাসিনার পক্ষে এ সংসারে সতীনের উপর সতীন হয়ে আসার ব্যাপারে কোন কিছু করার উপায় ছিল কি? গরিব মা বাবা । খেতে পড়তে পেত না । বিয়ে হওয়াই সমস্যা ছিল । সে ত আর বিয়ে করেনি, তার সম্মতি নেওয়ার ব্যাপার ছিল না ।" (৭৭)

জাহিরা নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে বোঝে যে পুরুষরা কখনোই নারীর চাহিদাকে দাম দেয়নি, তাই তার খুব মায়া হয় হাসিনার উপর এবং সেবা শুশ্রূষা করে হাসিনার ।

জাহিরা অচ্ছুৎ হয়ে পড়ে থাকে সংসারের এককোনায় । তারই সংসার ছিল, নিজের হাতে তৈরি করা সংসার আজ যেন তার কোনো অধিকার নেই । স্বামী তার কাছে কিছু চায় না, সেও দেয় না । স্বামী কখন যে কি করে তা সে জানে না । এরপর রয়েছে শাশুড়ি, তাকে সব সময় খুশি রাখতে হয় তার । এমনকি ননদের আলাদা সংসার হলেও তাকেও খুশি রাখতে হয় । কোনো জিনিস রান্না করে পুরুষরা খাবার পর শাশুড়ি-ননদের পরেই খেতে পাবে দু'সতীন যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, অন্যথা হলেই যন্ত্রণা শুরু । এত কিছুর মধ্যে স্বামীকে পায় না জাহিরা । জীবনটা যেন নরক হয়ে ওঠে, সে যেন হেরে যেতে বসে । অন্যদিকে খবর পায় মাসুদ আসমাকে নিয়ে নিজের ভিটেতে চলে গেছে । ফলে স্বামীর হাত পা ধরে মাফ চায় জাহিরা কিন্তু স্বামী তাকে মাফ করেনি --

> *"আবার সে সংসার ফিরে পেতে চায়, স্বামী ফিরে পেতে চায় না হলে বাঁচবে কি করে? নতুন করে যেন বাঁচতে চায় । সংসারে তার অবদান কম নয় । তাকালেই সংসারটা তার চোখে ধরা দেয় । বুকের ভেতরটা হাহাকার করে ওঠে । কেন সে অবহেলায় এ সংসারে পড়ে থাকবে? তার কি কোন অধিকার নেই? তারও কি স্বামী নয়? তারও কি সংসার নয়?"* (৭৮)

সংসারে মাসে যা চাল লাগে তা মইবু একবারে কিনে আনে হিসেব করে । মাসও যায় চালও শেষ হয়, তার হিসেব থাকে । কিন্তু এ মাসে হাসিনা চুরি করে কিছু চাল বেচে দিলে মাসের আগেই চাল শেষ হয়ে যায়, যার দোষ পড়ে জাহিরার উপর । স্বামী বলে ওঠে --

> *"চাল ফুরোবার ত কথা নয় । এত চাল গিলেছে কে ? ক্ষিপ্ত কণ্ঠস্বর চড়ে ওঠে মইবুর । মাস শেষ হয়নি চাল গেল কুথা ?"* (৭৯)

এই চিৎকার চেঁচামেচিতে শাশুড়ি-ননদ চলে আসে । জাহিরার মাথায় রাগ চড়ে যায় । সে বলে ওঠে --

"ঠিক আছে, তুমার চাল আর খাবুনি, নিজের গতর খেটিয়ে এনে খাব ।" (৮০)

মইবু সুযোগ পেয়ে বলে ওঠে..... ।

"তাই যদি খাস ত এই ভিটেতে আছিস কেন ?" (৮১)

এই জাহিরা অধিকারের কথা বললে --

এই সুযোগেই মইবু নিজের মূর্তি ধারণ করে । সে বলে --

"তালে তালাক লিয়ে লে ।" (৮২)

জাহিরা দরজা ধরে আঁতকে ওঠে, কিন্তু মইবু কেন সুযোগ হাতছাড়া করবে ! সে সুযোগের সদ-ব্যবহার করে --

"তোর সাথে আজ কুনু সম্বন্ধ নেই । তালাক তালাক তালাক ।" (৮৩)

একথা শুনে জাহিরা অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে । জ্ঞান হলে তার কিছু মনে পড়তে চায় না । কী যেন হয়েছে তার । তারপর ধীরে ধীরে মনে পড়ে তাকে স্বামী তালাক দিয়েছে । তালাক হয়ে গেলে তাকে আর স্বামীর বাড়িতে রাখতে নেই এমনই নিয়ম সবাই মনে করে । তাই ননদ তাকে তাদের বাড়ি নিয়ে যায়, জাহিরা যেন পাগলির মত দুলতে দুলতে যায় ।

অর্থাৎ এই পুরুষ-শাসিত সমাজ খুশিমত বিয়ে এবং তালাক দেয় এবং সেটা তাদের জন্মগত অধিকার বলে মনে করে । এবং সমাজের ধর্মীয় নেতারাও এতে সামিল, শিক্ষিত-অশিক্ষিতরা তো আছেই । কিন্তু সত্যিই কি তাদের এই অধিকার জন্মগত ? ইসলাম কি সত্যিই ছেলেদের এই অধিকার দিয়েছে, দিলে কতটুকু দিয়েছে ?

মুসলিম সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা 'তালাক' সমস্যা । ইসলামে তালাক একটি ঘৃণ্য পদ্ধতি বা নিরুপায়ের উপায় । স্বামী-স্ত্রী যখন আর কোনভাবেই একসাথে থাকার অবস্থায় না থাকে তখন এই পদ্ধতির প্রয়োগ করতে হয় নিঁখুত নিয়মে বা

পদ্ধতিতে । কিন্তু মুসলিম সমাজে মানুষ নিজের অধিকার বা ক্ষমতার বলে ইচ্ছামত এই পদ্ধতির প্রয়োগ করে স্বামী-স্ত্রীদের আলাদা করে নানা সমস্যার সৃষ্টি করে যা আফসার আমেদের *'ধানজ্যোৎস্না'* (১৯১৩) উপন্যাসে ফুটে উঠেছে ।

উপন্যাসের মধ্যে দেখা যায় সখিনার বিয়ে হয় নুরের সঙ্গে । নুরের বাবা না থাকলেও অবিভাবক তার বড় ভাই । নুর ও সখিনা দুজন-দুজনকে পেয়ে খুশি ও সুখী । বিয়ের আগে পরিচয় না থাকলেও বিয়ের পরে একে অপরকে গভীর ভাবে ভালবাসত । তাদের সুখের সংসার চলে যাচ্ছিল সুন্দর ভাবেই । কিন্তু বিয়ের আড়াই বছরের মাথায় আচমকা ঘটে যায় একটি ঘটনা যা এই সুখী দম্পতিকে চিরকালের জন্য আলাদা করে দেয় । সখিনার বাবার এক আত্মীয় ছিল প্রধান, আর নুরের বড় ভাই এই প্রধানের কাছে লোনের জন্য আবেদন করে । এই লোন যাতে পায় তার জন্য সখিনার বাবাকে প্রধানের কাছে অনুরোধ জানাতে বলে নুরের বড় ভাই । কিন্তু ঐ প্রধানের সঙ্গে বনিবনা না থাকায় সখিনার বাবা সুপারিশ করতে পারেনি । নুরের ভাইও লোনটা পায়নি । তাই মনে মনে সখিনার বাবাকে শায়েস্তার কল্পনা করতে থাকে নুরের বড় ভাই । এমন সময় একটি মোক্ষম চালও পেয়ে যায় । কার মুখ থেকে শুনে ফেলে যে নুরের বিয়ের জন্য যাকে দেখিয়েছিল সখিনা সে নয় । অর্থাৎ একজনকে দেখিয়ে অন্যজনের সাথে বিয়ে দেওয়া হয়েছে । ফলত বড় ভাই পঞ্চায়েতে নালিশ করে । বিচারে সখিনার বাবা দোষী সাব্যস্ত হয় এবং শাস্তি স্বরূপ সখিনা ও নুরের তালাক হয় ।

সত্যি কনে দেখার সময় কনে সখিনা বাড়িতে ছিল না, সে ছিল মামার বাড়িতে । সখিনাকে দেখতে আসার খবর যাকে দিতে বলা হয়েছিল সে দেয়নি । ফলে যখন সখিনাকে দেখার জন্য শ্বশুর বাড়ির মানুষ তাদের বাড়ি পৌঁছায় মামার বাড়ি থেকে সখিনাকে নিয়ে এসে কনের আসনে বসানো সম্ভব ছিল না, তাই সখিনার পিসির মেয়ে খুশিকে সখিনার আসনে বসিয়ে কনে দেখায় এবং বিয়ে হয় সখিনার সাথে, যদিও খুশি সখিনার চেয়ে দেখতে ভালো ছিল না । বিয়ে-পরবর্তী সময়ে সখিনাকে নিয়ে শ্বশুর বাড়ির কারো বা নুরেরও কোনরকম সমস্যা দেখা দেয়নি, উপরন্ত নুরের সাথে ছিল

মধুর সম্পর্ক । কিন্তু এই দুর্ঘটনার ফলে তাদের আজ আলাদা করে নুরের বড় ভাই । সালিশি সভা নামমাত্র বিচার করে, কেউ পাত্র-পাত্রীর মুখের বা মনের কথা শুনতে চাইল না । পঞ্চায়েত নুরের বড় ভাই ও সখিনার বাবার ঝগড়ার কথা শুনেই রায় দেয় বিচ্ছেদ --

> *"যে বাড়িতে মেয়ে দিয়েছে সে বাড়ির কেউ অপমানিত না হয়, এটা লৌকিক রীতি । সে ব্যাপারে সব মেয়ের বাবারা সমঝে চলে । কিন্তু কনের বাবার সাথে ভাশুরের ঝগড়া দুর্ঘটনার মতো ঘটেই যায় । ভাশুর অপমানিত হয় । অপমানের শোধ নিতেই পঞ্চায়েত অফিসে সালিশি ডেকে বিচ্ছেদ হয় । কনে বদল হয়েছিল কিনা, এই অভিযোগের বিচার হয় । অভিযোগ প্রমাণ হওয়ায় শাস্তি হয় বিচ্ছেদ । কাগজ কলমে বিচ্ছেদ হয়ে যায় । স্বামী-স্ত্রী তারা বিচ্ছেদ চায়, না মিলন চায়, একথা ওঠেনি ।"* (৮৪)

বিচ্ছেদের চার মাস পরেই সখিনার বিয়ে হয় নুরের মাসির ছেলে মেহেরের সঙ্গে । সুখে-দুখে কোনরকমে দিন চলে মেহেরের । সে পরের বাড়িতে জন দেয়, মাটি কাটে, মাঝে মাঝে কিছু ধান চাষ করে সংসারটা কোনরকম চালায় । কেটে যায় চৌদ্দটা বছর । নুর কোনদিন তার মাসতুতো ভাই মেহেরের বাড়িতে আসেনি । চৌদ্দ বছর পর হঠাৎ একদিন দুপুর বেলা নুর এসে হাজির হয় মেহেরের বাড়িতে । মেহের বাড়িতে না থাকায় সখিনা খুব বিপদেই পড়ে যায় । কোন রকমে কোন কথা না বলে ইশারায় বসতে দেয় এবং নুর নিজের ভুলের জন্য ক্ষমা চায় সখিনার কাছে । কারণ সে সেদিন কিছুই বলতে পারেনি বড় ভাই-এর ভয়ে কিন্তু আজও সখিনাকে ভুলতে পারে না । তেমনি সখিনাও ভুলতে পারেনি নুরকে । কেমন যেন তার আজও মনে হয় সে নুরেরই সংসার করছে । বিভিন্ন চলনে বলনে সে মেহেরের মাঝে নুরকে খোঁজে । সখিনা মেহেরকে অবশ্যই ভালবাসে হয়তো একটু বেশিই ভালবাসে নুরের কারণে । এতদিন যে আগুন অল্প অল্প করে জ্বলছিল তা যে আজ নুর এসে গনগনে করে দিয়ে যায় । সখিনা কিছুতেই রাতে ঘুমাতে পারে না । সখিনা একদিকে মেহেরের সংসার

করে মেহেরকে ভালবাসে এবং গোপনে আর এক সখিনা যেন ভালবাসতে থাকে নুরকে । এইভাবেই সখিনা এবং নুরকে বিনা দোষে সারাজীবন ক্ষত-বিক্ষত হয়ে দ্বি-সত্তার অধিকারী হয়ে বেঁচে থাকতে হয় ।

বিশ শতকে গোড়ায় এবং একুশ শতকের শুরুতে সমস্ত বর্বরতাকে পিছনে ফেলেও ধর্মীয় এজেন্টের মিথ্যা স্বার্থপর শাসানিতে কীভাবে সুখের দাম্পত্য জীবন ছিন্ন হয়ে রক্তাক্ত হয়ে উঠে তারই সুনিপুণ চিত্র ফুটে উঠেছে আফসার আমেদের *'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা'* (১৯৯৫) উপন্যাসটিতে । ধর্মীয় শাসনের বেড়াজালে যুগের পর যুগ ধরে মুসলিম নারীদের অপদস্ত হতে হচ্ছে । ধর্মীয় শাসকদের স্বার্থপরী ধর্ম ব্যাখ্যায় খেলার পুতুল হয়ে উঠে আফসার আমেদের চরিত্র নাসিম ও তার তালাক না পাওয়া বিবি জাহান । একদিন পুকুরের সাঁতার কাটার সময় শাড়ি খোয়া গেলে নিরুপাই হয়ে শুধু সায়া আর ব্লাউজ পরে উপরে উঠে আসে ধার্মিক নাসিমের বিবি জাহান । রাতে এ ব্যাপারে কথা কাটাকাটি হলে নাসিম জাহানকে চড় মারে এবং শুয়োরের বাচ্চি বলে গালি দেয় । ফলে রাগে অভিমানে ভোরবেলা বাপের বাড়ি চলে যায় জাহান । এদিকে নাসিমও লজ্জায়, অভিমানে এবং ঠ্যাঙাড়ে শ্বশুরের ভয়ে বিবিকে আনতে যায়না । তাদের দুজনের মধ্যে আগাধ ভালবাসা থাকলেও একে অপরের কাছে অভিমানে যায়নি । এভাবে কেটে যায় চোদ্দটা দিন ।

এদিকে নাসিম ও তার বিবি জাহানকে নিয়ে জনমানসে এক চাপা উত্তেজনা কাজ করে । পরহেজগার নাসিমও রীতিমত ধর্মীয় রীতি মেনে চলে । সে ভাবে তার বিবির অভিমান ভাঙলেই সে চলে আসবে । কিন্তু সিনেমার প্রচারক গাজি জনগনের উত্তেজনায় একটি নতুন গল্প বানিয়ে ফেলে । সচারাচরই সে নতুন নতুন গল্প তৈরি করে জনমানসে প্রচার চালায় --

> *"পাশ করা বেকার যুবক গাজি সকাল থেকে বাজারে চায়ের দোকানে বসে কাটায় । নানা গুলতানি করে ... । সিনেমা প্রচার করতে করতে নানা মিথ্যা কথা বলার অধিকার পেয়েছে সে ।*

এই রঙ চড়িয়ে বলা ও কিছু মিথ্যের মিশেল দেয়া, তার নিজেস্ব রচনা ।" (৮৫)

এভাবে মিথ্যা কাহিনি বানাতে বানাতে সে একদিন একটি নতুন কাহিনি বানিয়ে বসে যা জনমানসে খুব জনপ্রিয় হয় । সে লোকজনকে বলে নাসিম তাঁর বিবিকে চৌদ্দ দিনের মাথায় দুজন সাক্ষী রেখে তালাক দেয় । কিন্তু সে দুজন সাক্ষীর নাম সে বলেনা, পাছে সাক্ষীর কাছে কেউ ঘটনার সত্যতা জানতে চায় --

"এই দুজন সাক্ষী ও কিছু বলাটা গাজির মস্তিক প্রসূত, একেবারে নিরেট গাজাখুরি । দুজন সাক্ষী রেখে গাজি তাঁর বউকে তালাক দেয় । দুজন সাক্ষী কে কে সেটা নাম ধরে প্রচার করা যাবে না । তাহলে যাচাই করতে চাইবে কে কে ।" (৮৬)

এবং এর সাথে সে একটি হলুদ পাখির কিস্‌সা জুড়ে দেয় । কিন্তু পাখিটার ব্যাপারে তাকে বানাতে হল না । তার মনে হয় পাখিটার কাহিনি সত্য হলেও হতে পারে --

"নাসিমদের পেয়ারা গাছে একটা হলুদ পাখি বসত । পাখিটা শুনতে পায় । একথা শুনে পাখিটার খুব দুঃখ হই । পাখিটা দুঃখে বেদনায় মারা যায় ।" (৮৭)

এভাবেই মিথ্যা তালাকের কাহানি জনমানসে প্রচার হতে থাকে এবং মান্যতাও পায় । এই কাহিনির সত্যতা আরও বলিষ্ঠ হয় যখন অলৌকিকভাবে নাসিমের পেয়ারা গাছের তলায় একটি হলুদ পাখির মৃতদেহ পাওয়া যায় । মিথ্যা তালাকের কাহিনি নাসিমের দাদা-বৌদি সহ ইমাম আজমত সাহেব বিশ্বাস করলেও কোনো ব্যক্তি বা ধর্মের রক্ষক আজমতও নাসিমের কাছে জানতে চায়নি তালাকের সত্যতা বা ধর্মানুযায়ী তালাকের সাক্ষী কে বা কারা । তারা জোর করে নাসিমের ওপর তালাক চাপিয়ে দিতে চায় । গ্রামের সকলেই জানত নাসিম ও জাহানের প্রেম-মহব্বতের কথা । তাই তারা নাসিমের প্রতি সহানুভূতির ছলে নাসিমের না তালাক দেওয়া বউকে নিকা করে নাসিমকে তার বিবি জাহানকে আবার বিয়ে করার সুযোগ করে দেওয়ার নামে নাসিমের

সুন্দরী স্ত্রী জাহানকে তারা একরাতের জন্য হলেও বিছানায় পেতে চায় । জাহানকে বিছানায় পাওয়ার লোভ থেকে বাদ যায়নি আজমত মৌলবিও । তাই সে কানা বেগুনওয়ালার পোশাকে ঘুরঘুর করে জাহানের ঘরের আশেপাশে । সে দুঃখের সাথে বলে --

> *"এই আধবুড়া বয়সে আর একটা বিয়ে করা তাঁর পক্ষে হয়ে উঠলোনা । অথচ আশেপাশের যত মৌলবি ইমাম আছে, তাদের বিবির সংখ্যা বেশি ।"* (৮৮)

আজমত মৌলবির প্রস্তাবে নাসিম তার তালাকের বিরোধিতা করলে গ্রামের অন্যান্যদের মত আজমতও ধর্মের ভয় দেখায় নাসিমকে --

> *"তালাক দেওয়া বিবি হারাম জানোতো ছোটমিয়াঁ ? এতদিনের এবাদত তোমার নষ্ট হবে । দোজখে ঠাঁই হবে তোমার ছোটমিয়াঁ ।"* (৮৯)

নাসিম পরহেজগার মুসল্লি মানুষ । সেও জানে --

> *"টানা তিনবার তালাক বললেই স্ত্রী বিচ্ছেদ হয়ে যায় । এই বিচ্ছেদ হওয়া ব্যাপারটা নিয়ে তাঁর কোনও বিরোধ নেই । ... কিন্তু তালাক না দিয়ে, তালাক প্রচার হওয়ার বিরোধী ।"* (৯০)

সত্যবাদী নাসিমের মুখ দিয়েই লেখক ধর্মের সত্যতাকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন । তালাক না দিয়েও তালাকের অপপ্রচারের বিরোধী হওয়ায় গ্রামের প্রত্যেকেই পাগল ঠাওরে ছোটমিয়াঁকে । কেউ আবার তাকে সান্তনা দিয়ে বলে --

> *"তালাক দেওয়া তো অন্যায় কিছু নয় । কোরানে আছে কেতাবে আছে ।"* (৯১)

'কুরআনে' বা কেতাবে তালাকের কথা আছে একথা সত্য, কিন্তু তাঁর এই তালাক 'কুরআন' বা কেতাব অনুযায়ী হল কিনা বা তা কতটা যুক্তিসঙ্গত তা তো ধর্মের রক্ষকরা বিচার করে দেখতে চাইল না । আর সমাজের এই কঠোর বাস্তবতাকেই

তুলির রঙ দিয়েছেন লেখক । যেখানে তালাকদাতা নিজেই তালাকের কথা অস্বীকার করছে, সেখানে ধর্মের পান্ডাদের প্রতিনিধি আজমত তাকে জানিয়ে দেয় তালাক দেওয়া অন্যায় নয় । সে বলে --

> *"একটা মেইয়াছেলার জন্য ঈমান নষ্ট করার কি আছে ছোটমিয়াঁ । বউ গেলে বউ পাবে, ঈমান গেলে পাবে না ।"* (৯২)

কিন্তু মৌলবি যেই 'মেইয়াছেলার' জন্য নাসিমকে ইমানের ভয় দেখায়, সেই 'মেইয়াছেলা' কেই আবার বিছানাতে পেতে চায় । সমালোচকের মতে --

> *"'মেইয়াছেলার' জন্য ঈমান নষ্ট না করার পরামর্শ দিতে পারে, তার মনেই স্বার্থদরদ উথলিয়ে উঠে 'মেইয়াছেলা' ভোগের সুযোগ পেয়ে ।"* (৯৩)

এভাবেই লেখক মুসলিম সমাজের নির্মম সত্যতা অর্থাৎ নারীর জীবনের চেয়েও ধর্মের মান বড়, তা ফুটিয়ে তুলেছেন । সমালোচকের মতে --

> *"যে ধর্মজ্ঞানীদের হাতে ন্যায় বিচারে দন্ড অর্পণ করা হয় সেই জ্ঞানীদের জ্ঞানের অন্ধতা ও স্বার্থপরতার নোংরামিতে সমাজদেহ কীভাবে ক্ষত বিক্ষত হয়, লেখকের সূক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে তা ধরা পড়েছে ।"* (৯৪)

কাহিনি ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় এবং হস্তান্তরিত হতে থাকে জাহান এক পুরুষের হাত থেকে অন্য পুরুষের হাতে । তবে তার হস্তান্তর হওয়াটা তথাকথিত ধর্মসাপেক্ষ । সমাজের চোখে, ধর্মের চোখে এতে কোনো অন্যায় নেই ।

সমাজ চোখ উঁচিয়ে থাকে কিস্‌সার জাহান এবার কার হাতে যাবে, কার বিছানার সঙ্গী হবে দেখার জন্য । এতে জাহানের কোনো দোষ নেই, সে বেশ্যা তকমা পায় না, যেহেতু তার এই হাত বদল, বিছানা বদল, রাতের সঙ্গী বদল ধর্মসাপেক্ষ ।

নাসিমের মিথ্যা তালাকের মিথ্যা তালাকিনী জাহান পরে চুড়িওয়ালাকে নিকাহ করে । কিন্তু হঠাৎ একদিন জাহানের আবদার না মিটিয়ে চুড়িওয়ালা বলে উঠে --

"তোকে আর আমি চাইনা । তালাক দিব ।" (৯৫)

যেই বলা সেই কাজ । সে জাহানের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে --

"তালাক তালাক তালাক" (৯৬)

যেমনভাবে ওঝা বিষ ঝেড়ে দেয়, চুড়িওয়ালা সেভাবেই তালাক দেয় জাহানকে । জাহান তালাক চায় কিনা সেটা জানার প্রয়োজন মনে করেনি চুড়িওয়ালা । জাহানও জানতে চায়নি তার তালাকের কারণ । তৎকালীন মুসলীম সমাজে নারীরা ছিল পুরুষের হস্তাগত । তার জানার বা মত প্রকাশের কোনো দাম ছিল না । তারা পুরুষের মুখ নিঃসৃত বাক্যকেই ধর্ম মনে করত ।

তালাকপ্রাপ্ত হওয়ার পরই জাহান কোনও তর্ক না করে পাশের ঘরে শুয়ে ভাবে --

"সে যেন খেলনার মত । কারুর ভাল লাগলে খেলে, তারপর ফেলে দেয় । অন্য একজন আবার খেলে । সে খেলার প্রয়োজনের খেলনা ।" (৯৭)

মুসলিম নারীদের পুরুষের হাতের খেলনা হয়েই থাকতে হয় । এক পুরুষের খেলার সখ মিটে গেলে অন্য পুরুষের হাতের খেলনা হতে হয় । পুরুষের ব্যবহার শেষ হলেই নারীকে তালাক দেয় পুরুষ । আবার অন্য কোনও নারীকে খেলনায় পরিণত করে নিকাহ ও তালাকের মাধ্যমে । আর এই খেলনা পরিবর্তন ধর্মসাপেক্ষ, যেহেতু ইসলামে চারবার বিয়ে সিদ্ধ । কিন্তু যদিও ইসলামে চারবার বিয়ে শর্তসাপেক্ষ ; স্বার্থলোভী, অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত সমাজের পান্ডারা ধর্মের এই ব্যাখ্যাকে নিজের মতো সাজিয়ে তাতে নিজের পছন্দমত রঙ লাগিয়ে নেয় । এবং এই রঙের বলি হয় মুসলিম নারীরা ।

এই তালাকের পর জাহান বিবি কানা বেগুনওয়ালার বিবিতে পরিণত হয় । জাহান যখন কানাবেগুনওয়ালাকে বিয়ে করতে যায়, তখন কানাবেগুনওয়ালা আজমত মৌলবিকে ডাকতে যায় নিকে পড়াবার জন্য । আজমত মৌলবিও টাকার লোভে তাড়াতাড়ি রাজি হয় । যখন আজমত মৌলবি জানতে পারে কানাবেগুনওয়ালার নতুন বিবির বয়স উনিশ-কুড়ি তখন সে আরও উৎসাহিত হয়ে পড়ে --

> *"আরও উৎসাহিত হয়ে পড়ে আজমত আরও বেশী কামার্ত, কানাবেগুন ওয়ালাকে দেখে তাঁর কেমন হিংসে হয় । একজন মামুলি চাষা, সে একটা বিয়ের ব্যাবস্থা করে ফেলতে পারল, আর সে কিনা পারল না ?"* (৯৮)

অর্থাৎ এ যেন নিকা করার প্রতিযোগিতা । কে কয়টা নিকে করে নিজের পৌরুষত্বের প্রমাণের প্রতিযোগিতা । 'কুরআনে' শর্তসাপেক্ষ চারটি বিয়ের কথা থাকলেও সমাজের ধর্মের ধ্বজাধারী স্বার্থলোভী মানুষেরা একে একটি প্রতিযোগিতায় পরিণত করেছে । সমালোচকের মতে --

> *"এই কাহিনীতে কামুক স্বার্থপর অর্থলোভী মৌলবি সম্প্রদায়ের ছবিতে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক । যারা ধর্মের ধ্বজা ধরে সমাজকে বিভ্রান্ত করে । বিকৃত ব্যাখা করে ধর্মীয় আইনকে । লেখকের তৈরী 'আজমত' ইমাম ও ধর্মের খোলশধারী ভন্ড মৌলবিদেরই প্রতিনিধি ।"* (৯৯)

এরপরও আজমত, জাহান অর্থাৎ কানা বেগুনওয়ালার স্ত্রীকে প্রেম নিবেদন করে নিকাহ করার প্রস্তাব দেয় । কিন্তু জাহান অন্যের স্ত্রী হলেও আজমতের স্ত্রী হতে রাজি না । কিন্তু নিজেকে রক্ষা করতে পারে না জাহান । নানীর কাহিনিতে ধরা দেয় কিভাবে জাহানকে ছিঁড়ে খায় চুড়িওয়ালা, কানা বেগুনওয়ালা এবং আজমত ইমাম; কিভাবে নিকা করা দুইজন ও না-নিকা করা আজমত ছিঁড়ে খেতে চায় জাহানকে । মানুষের রক্ষাকারী ধর্মই কিভাবে নারীকে

প্রত্যেক কামুক পুরুষের থালার লোভনীয় খাবারে পরিণত করে তারই জলন্ত দৃষ্টান্ত এই উপন্যাস । মুসলিম নারীদের প্রতিনিধি জাহানের এই ব্যাপারে কিছুই বলার থাকেনা, কারণ তা ধর্মসাপেক্ষ ।

অন্যদিকে ধর্মের প্রতিনিধি নাসিম নিজে পাগল প্রমাণিত হলেও তার বিবিকে পরিত্যাগ করে না । সে জাহানকে তার বিবি মনে করে, কারণ সে তাকে তালাক দেয়নি । সে কিছুই বলে না । কিন্ত তার ধর্মের মধ্যেই এত বেশি অধর্ম ঢুকে আছে যে তার পক্ষে প্রতিবাদ করাই অর্থহীন হয়ে পড়বে । লোকে তাকে পাগল বলবে । লোকমুখে প্রচলিত কিস্‌সা দিয়েই তাকে মারে লোকেরা । কিন্তু এই অধর্ম-ধর্মকে কতদিন মানতে হবে ? কতদিন জাহানরা পুরুষের হাতের খেলনা হয়ে ঘুরে বেড়াবে ?

মুসলিম সমাজের বিয়ে ও তালাকের সমস্যা নিয়ে রচিত একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস আফসার আমেদের *'দ্বিতীয় বিবি'* (১৯৯৭) । উপন্যাসের মধ্যে লেখক মুসলিম সমাজের বিয়ের আইন এবং তালাকের এক নির্মম চিত্র এঁকেছেন শোভান, কিসমত ও হামিদার মাধ্যমে । উপন্যাসের মধ্যে আমরা দেখি শোভান ও কিসমতের সুখের ছোট সংসার । শোভান ও কিসমতের কোনো সমস্যা নেই । তাদের কোনো পাড়া প্রতিবেশি নেই । নিবিড় প্রেম ভালবাসা এবং বরজ ও কৃষিকাজ নিয়ে তাদের সুখের সংসার । তাদের তেমন জমিজমা না থাকলেও কিসমত ও শোভান উভয়েই তিল তিল করে গড়ে তুলেছে তাদের এই সংসার । কিসমত সব দিক দিয়েই শোভানের মনের মত কিন্তু কিসমতের কোনো সন্তান হয়নি ; এই নিয়ে কিসমত বেশ কয়েকবার শোভানকে দ্বিতীয় বিয়ে করতে বলে । কিন্তু সরল শোভান কিসমত ছাড়া অন্য কাউকে ভাবতে পারে না । তবে কিছু দিন যেতেই দুদিনের মনে মনে করা সংকল্পে কাউকে না জানিয়ে হুট করে বিধবা যুবতী হামিদাকে বিয়ে করে আনে শোভান । কিসমত নিজেই শোভানকে বিয়ে করতে বলেছিল একসময় কিন্তু শোভান বোঝেনি যে সে তার মন বোঝার জন্য বিয়ের কথা বলেছিল । বিয়ে করে আনার পর কিসমতের ভয়ে হামিদার ঘরে যাওয়ার সাহস হয় না শোভানের । কিসমত কোনো মতেই স্বামীর ভাগ কাওকে দিতে চায় না । সে সবসময় দুজনকে চোখে চোখে রাখে । হামিদা নানাভাবে চেষ্টা করে শোভানের সাথে

মিশতে, কিন্তু এ নিয়ে কিসমতের সাথে ঝগড়াতেও যায় না । একদিন সুযোগ পেয়ে পানের বরজে হামিদা শোভানের কাছে চলে যায়, এতে নানারকম অশান্তি তৈরি হয় । হামিদা না খেয়ে ঘরে দরজা দিয়ে শুয়ে থাকলেও কিসমত তাকে খাওয়ার কথা বলেনি ; এমনকি শোভানেরও সাহস হয়নি কিছু বলার । তাই শোভান পাড়ার সাজেদা বিবিকে পাঠায় কিসমতকে বোঝাতে । সে এসে বোঝায় যে নিকা করা স্বামীর উপর দুজনেরই সমান অধিকার ।

শোভান প্রকাশ্যে হামিদার সাথে কথা বলা তো দূরের কথা, তার দিকে তাকাতেও সাহস করে না । তাই সে একদিন রাত্রে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে ঘরে ফেরে এবং মাতাল অবস্থায় বলতে থাকে সে কাউকে ভয় পায় না, সে হামিদার কাছে ঘুমাবে । শোভানের এই ঘটনায় হতভম্ভ হয় দুই সতীন । কী করা উচিত কেউ বুঝতে পারে না । এদিকে দু'সতীনে বসে থাকে চুপচাপ । হামিদা যায় না শোভানের কাছে । এতদিন পর্যন্ত যে হামিদা সুযোগ খুঁজত শোভানের সাথে দেখা করার, আজ সুযোগ পেয়েও যায় না কারণ সে মনে করে যে মানুষটা স্বাভাবিক অবস্থাতে মুখ তুলে তাকাতে পারে না তার দিকে সে মাতাল অবস্থায় সাহস দেখায় যা হামিদার কাছে জঘন্য কাপুরুষের ব্যপার । এই কাপুরুষের কাছে যেতে তার ঘেন্না করছিল তাই কিসমতকেই যেতে বলে হামিদা । কিসমত সুযোগ পেয়ে হামিদাকে লাথি ঘুসি মেরে স্বামীকে দখল করে । এরপর থেকে হামিদা নিজেকে একেবারে গুছিয়ে নেয় । যে শোভান তার কাছে স্বপ্ন ছিল এখন তা ভয়ে পরিণত হল । সে এখন শোভানকেই বেশি ভয় পায়, চেষ্টা করে কোনোমতেই যাতে কিসমত তাকে শোভানের কাছে একলা রেখে কোথাও না যায় । কিন্তু একদিন কিসমতের বাবার বাড়ি থেকে আত্মীয়ের অসুস্থতার খবর আসে । শোভান তখন বাড়িতে ছিল না, জমিতে কাজে গিয়েছিল । এই সুযোগে কিসমত ঘুরে আসবে বলে বাবার বাড়ি বেরিয়ে পড়ে । হামিদা কাকুতি মিনতি করলেও তাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে বাড়িতে রেখে যায় কিসমত । কিসমত যাবার পর হঠাৎ করে শোভান বাড়িতে আসলে হামিদার প্রাণ শুকিয়ে যায় । এই ফাঁকা সুযোগ কাজে লাগিয়ে হামিদার কাছাকাছি আসতে চায় শোভান আর হামিদা চায় এই কাপুরুষের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে । কিন্তু শেষ পর্যন্ত হামিদা নিজেকে বাঁচাতে পারে না, কেননা সে শোভানের

বউ তাই স্ব-অধিকারে ব্যবহার করে হামিদাকে । হামিদা জীবনে প্রথম ধর্ষণের স্বাদ পায় ।

ইসলাম ধর্ম পুরুষকে একের অধিক বা একসঙ্গে চারটি বউ রাখার যে অধিকার দিয়েছে তা নিয়ে সমাজের মধ্যে যে বিশৃঙ্খলা দেখা যায় আফসার আমেদ 'দ্বিতীয় বিবি' তে তারই একটি রূপ অঙ্কন করেছেন । ইসলাম কেন পুরুষকে একের অধিক বিয়ের অধিকার দেয় বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিভাবে এই বিয়ে করা যাবে তা না জেনেই বা ভুল তথ্য জেনে সুখের সংসারে চরম অশান্তি নেমে আসে, তারই দলিল এই উপন্যাস । শোভান ও কিসমতের সুখের ছোট সংসার, যেখানে প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা কোনো কিছুরই খামতি ছিল না । শোভান ও কিসমত দু'জন দুজনকে নিয়ে সব দিক দিয়েই খুশি এবং সুখী । গ্রামের ক্ষুদ্র চাষি এই শোভানের একটি অভাব দেখা দেয় যে তাদের বিয়ের কিছু বছর গেলেও সন্তান হয়নি । শোভান ও কিসমতের কাছে ছেলে-মেয়ের দরকার হলেও সংসারে কোনো রকম অশান্তি ছিল না । তবে কিসমত কয়েকবার অন্য একটা বিয়ে করতে বলে শোভানের মন পরীক্ষা করে । কিছু দিনের মধ্যেই শোভান ইসলামের আইন তথা শরিয়তি আইন নিজের মত বুঝে বা প্রচলিত সমাজে দেখে হুট করে হামিদাকে বিয়ে করে ঘরে আনে । অর্থাৎ তার যে সন্তানের দরকার তা হামিদার কাছে পাওয়ার আশায় বিয়ে করে ।

অত্যন্ত সহজ সরল এবং লাজুক মানুষ শোভান । এত সহজ-সরল মানুষও একের অধিক বিয়ের আইনের কথা শুনে হঠাৎ বিয়ে করে ফেলে । বিয়ে করার পর আবার নিজেকে খুব খারাপ লাগে, হামিদার কাছে যেতে খারাপ লাগে --

> *"দরজার আলোর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই দেখতে পাবে তাকে কিসমত । প্রকাশ হয়ে পড়বে শোভানের লোভ আর আকাঙ্খা কিসমতের কাছে । কিসমত দেখল শোভান হামিদার কাছে যাচ্ছে, যাবার ইচ্ছে নিয়ে আছে । সেভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে লজ্জা পায় শোভান ।"* (১০০)

যে মানুষ এত লাজুক সেও কেমন করে মনের বলে আর একটা বিয়ে করে নেয় । তবে সমাজে যারা সাহসী, ধনী বা প্রতাপযুক্ত তাদের অবস্থা কী হতে পারে তা সহজেই অনুমেয় ।

বিয়ে করায় কিসমত খুব কষ্ট পেয়েছে জেনে শোভান অন্ধকারে শুয়ে থাকে । দরিদ্রের সংসারে এইভাবেই কেরোসিন বাঁচায় কিসমত । এই অন্ধকারে শোভান ঘরে যায় এবং শুয়ে থাকা বউকে কিসমত ভেবে বলে --

"তুই আমার সব, নতুন বউ বাচ্চা দেবে বলে বিয়ে করেছি ।" (১০১)

এই সহজ সরল মানুষ যে শুধু উত্তরাধিকারের জন্যই বিয়ে করতে পারে তাহলে একই সমাজে ক্ষমতা ধারীরা কি করতে পারে এবং নারীদের কি চোখে দেখতে পারে । সাধারণ মানুষ শোভান যখন নারীকে শুধুই সন্তান জন্মের যন্ত্র হিসাবে দেখে তবে উচ্চবিত্ত স্বচ্ছল মানুষেরা কিভাবে দেখবে তা আমরা টের পাই । অর্থাৎ শোভান দুই স্ত্রীকে সমান চোখে দেখতে পারবে না, সমান ভাবে ভালবাসতে পারবে না-এটাই প্রমাণ করে তার এই উক্তি ।

পুরুষ নিজের ইচ্ছায় একের বেশি বিয়ে করে আইন দেখিয়ে । এক্ষেত্রে যে বউ থাকতে স্বামী অন্যজনকে বিয়ে করে সেই বউ এবং যাকে বিয়ে করে সেই নতুন বউ দুজনেই দোষী এবং পুরুষ আইন পালন করে নির্দোষ । হামিদাকে যখন শোভান বিয়ে করে আনে তখন কিসমত হামিদার কাছে ঘেঁসতে দেয়নি শোভানকে । হামিদার এর আগে বিয়ে হয়েছিল, স্বামী সাপের ছোবলে মারা যায় । কিসমত হামিদাকে নানা রকম গঞ্জনা দেয় এবং মরা স্বামীর সাথে মরে গেলেই ভালো করত তা বোঝায় । হামিদা দেখে বাবা বিয়ে দিয়েছে, স্বামী বিয়ে করে বাড়িতে এনেছে কিন্তু স্বামী তার দিকে তাকাতেও সাহস পাচ্ছে না, সতীনের ভয়ে কাছে যাওয়া তো দূরের কথা । সে অবহেলিত হতে থাকে আর ভাবে --

"তার কতটুকু পাওনা, তাকে কতটুকু দেওয়া হচ্ছে, এইসব বুঝতে চাইছিল সে । আর ঘুরে ফিরে ভাবছিল তার দশার কথা ।" (১০২)

একদিকে পুরাতন বউ অর্থাৎ প্রথম বউ কিসমত এবং অন্যদিকে নতুন বউ দুজনেই চায় স্বামীর অধিকার । কিসমত কোনোভাবেই স্বামীকে ভাগ হতে দিতে চায় না আর হামিদা প্রাপ্ত পাওনা আদায়ের নানা চেষ্টা করে । শেষে হামিদা দেখে যে তাকে বিয়ে করে এনেছে তার কোনো হেল দোল নেই হামিদার ব্যাপারে । যে নিজের স্বাভাবিক অবস্থায় হামিদার সাথে দেখা করতে পারে না, যে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে শক্তি নিয়ে হামিদার কাছে যেতে চায়, এতে হামিদার সমস্ত ভালোবাসা ঘৃণায় পরিণত হয় । সে ভাবে --

> *"চায় না তার এমন পুরুষ, যে তাকে আর একটা বিবি থাকতে বিয়ে করে, এবং বিয়ে করেও বিবির অধিকার দেয় না ।"* (১০৩)

শোভানও তাকে স্ত্রীর মর্যদা দিতে এগিয়ে আসেনি । সে সবসময় কিসমতের মন যুগিয়ে চলতে চেয়েছে । আর হামিদাকে তার মনেও পড়ে না । সংসারে গৃহপালিত পশু কিনে এনে মানুষ যতটা গুরুত্ব দেয় শোভান হামিদাকে নিয়ে এসে ততটাও দিতে পারেনি । সে কিসমতের জন্য তাকে ভুলে থাকে --

> *"যেহেতু তার কিসমত আছে, সেহেতু হামিদাকে জীবনের সঙ্গে অনিবার্য করতে পারে না । হামিদা সংসারে থেকেও নেই হয়ে থাকলেও শোভানের চলে । ইচ্ছে করে ভুলে থাকলেও চলে, অনিচ্ছায় ভুলে থাকলেও চলে, অবহেলায় ভুলে থাকলেও তার চলে । হামিদাকে কাছে পেয়ে আমোদই একমাত্র সম্বল হয় তার । কোনো দিন এই মেয়েটার জন্য প্রাণ হুহু করে উঠবে নাকি তার ? যেমনটা কিসমতের জন্য করে থাকে ? সে দায়িত্ব নিতে চাইছে না শোভান ।"* (১০৪)

অর্থাৎ হামিদাকে বাজারে কেনা খেলনা বা হাটে কেনা পশুর মতই মনে হয় শোভানের । যেমন খেলনা শিশুর আমোদ সঞ্চার করে তেমনি শুধুমাত্র আমোদের লোভেই তাকে ঘরে আনা ।

অন্যদিকে কিসমত থাকতে তার স্বামী আর একজন নারীকে বিয়ে করায় কিসমতের দোষ দেখে পাড়া প্রতিবেশী । হামিদা না খেয়ে ঘরে খিল দিয়ে শুয়ে থাকলে কিসমতকে বোঝানোর জন্য শোভান সাজেদা বিবিকে ডেকে আনে । সাজেদা আসলে কিসমত নানা গল্প করে এবং নিজের কথা ভাবে । একটা সংসারকে একজন নারী তিল তিল করে গড়ে তোলে এবং যখনই স্বামী আর একজনকে বিয়ে করে আনে প্রথম দিনেই সমস্ত দুভাগে ভাগ হয়ে যায় যা মেনে নিতে পারে না কিসমত । সে না খেয়ে সংসারটাকে সাজিয়ে তুলেছিল, এর মধ্যেই বিপত্তি । সে সাজেদাকে বলে --

> *"উ সোয়ামীর ধারে বাড়ে না যায়, গেলে ঝোটিয়ে বিদেয় করে দোব, মুইও মল্লিকের বেটি, মল্লিকের গোঁ জানেনা ।"* (১০৫)

এতে সাজেদা কিসমতেরই দোষ দেখে --

> *"আল্লা যে তোর খাতায় গুনা লিখবে গো মেয়ে, লিকে করা বিবি, তার কাছে মরদ না গেল আল্লা গুনা লিখবে । লিকে করে এনেছে, ওরও তোর মতন হক হয়ে গেল ।"* (১০৬)

অর্থাৎ স্ত্রী যতই কষ্ট করুক স্বামী খুশি হয়ে আর একটা বিয়ে করলেই সমস্ত কিছুতেই সমান ভাগীদার হয়ে গেল একথা কিসমত মানতে পারে না --

> *"মোরা মেয়ে মদ্দ ওর হক মানিনি চাচি, দুবিঘে জমির ধান আর বরজের রোজগার দিয়ে মোদের চলে, মোরা দুখের ভাত সুখ করে খাই । যাদের উতি ধানে পুতি আছে তারা দুটো বউ কি চারটে বউ পালতে পারবে-মোদের ই ঝামেলা কেন চাচি ? মোর হাতে লাগানো গাছ, মোর হাতে হালগরু খায়, মোর উঠুনে মুই ঝ্যাঁটা দিই ন্যাতা দিই, গোবর কাঁড়ি ঘুঁটে দিই, মোর চুলো মোর বাতা কাঁথা কানি, পানের দাবর বাটা জাতি শিলনোরা, সেখানে ঘরভিটেতে আর একজন এসে কেন ভাগ বসাবে ? মুই এ সব মেনে নোবনি ।"* (১০৭)

সাজেদা নানাভাবে মানিয়ে নিয়ে চলার কথা বলে কিসমতকে । এবং ধীরে ধীরে অভ্যাস হয়ে যাবে --

> *"ও কথা বললেই তো হবে না, যার যা ভাগ তাকে দিতে হবে বে ইনসাফি করলে দোজখের আগুনে জ্বলতে হবে ।"* (১০৮)

দোজখের (নরকের) ভয়েও যখন ভীত হয় না নতুন বউকে ঝ্যাঁটা মেরে তাড়াতে চাইলে সাজেদা কিসমতকে বলে --

> *"ও বউ, তুই অন্যায় বলছিস । নিজের সোয়ামীকে ধরে রাখতে পারলি না-এখন বলছিস সোয়ামীর বিয়ে করা নতুন বউকে ঝ্যাঁটা মেরে তাড়াবি ? লাফ কেটে কেন গেল মিনসেটা, বিয়ে করতে ? তখন তুই কি করছিলি ?"* (১০৯)

এখানেও কিসমতের-ই দোষ । স্বামী যাকে বিয়ে করে আনল পুরানো বউয়ের কাছে সে দোষী আর সমাজের কাছে দোষী পুরানো বউ । সমাজের মুরুব্বিরা বা মোল্লা-মৌলবিরাও দোষী মনে করে না শোভানকে, সবার কাছে দোষী এই নারী । কেউ শোভানকে বলেনি কেন দ্বিতীয় বিয়ে সে করেছে --

> *"কী উদ্ভট সমস্যায় পড়েছে না সে ! মোল্লা মৌলবিরা তাকে কেউ তো বলতে আসেনি, একটা বিবি থাকতে, আর একটা বিবি নিকে করে নিয়ে আসা তোমার না-জায়েজ । বরং দাওয়াত খাওয়ার জন্য তাদের জিভে জল সরছে ।"* (১১০)

শোভান যখন নতুন বউয়ের কাছে স্বাভাবিক ভাবে যেতে পারে না তখন মদ খেয়ে মাতাল হয়ে যেতে চায় । ফলে হামিদার ঘৃণা আরও বাড়ে শোভানের প্রতি, সে তাকে উপেক্ষা করে, পাত্তা দেয় না । এতে শোভানের আত্মসম্মানে লাগে, সে মনে মনে ভাবে কিসের এত দেমাক --

"একটা কোকিল তিন বার কু কু কু ডেকে ওঠার সময়ের চেয়েও অল্প সময় লাগে এই মেয়েটাকে বিচ্ছেদ দিতে, তা হবে বিধিসম্মত, কারুর কাছে প্রশ্নের সম্মুখীন হতেও হবে না, হামিদা কি ভয় পায় না ?" (১১১)

অর্থাৎ, পুরুষ ইচ্ছেমত যেমন বিয়ে করে কোনো অপরাধ করে না, তেমনি মুহূর্তে তাড়িয়ে দিলেও কারো কাছে কোনো কৈফিয়ত দিতে হয় না এবং এটা শাস্ত্রসম্মত বলেই মনে করে । তাই শেষপর্যন্ত শোভান হামিদাকে টেনে হিঁচড়ে, পিটিয়ে গালি দিতে দিতে বাড়ি থেকে বিদেয় করে --

"খোল হারামজাদি, তোকে ঘরছাড়া করে আজ ছাড়ব । আমারই খাস, আমারই চোখের সামনে তেজ দেখাস ! দেখি কে তোকে আজ রক্ষা করে । ..... দরজায় লাথি মারে শোভান.....চালের বাতায় হালের গরুকে মারার পাচনবাড়ি ছিল, সেটা টেনে আনে । আর সেটা দিয়ে বেদম পেটাতে শুরু করল..., যা বেরিয়ে যা ঘর থেকে । তোর মুখ দেখতে চাইনা । এ ঘরে তোর ঠাঁই নেই ।" (১১২)

হামিদা শুধু এইটুকু বোঝে যে লোকটা তাকে ভিটে ছাড়া করছে সে তার স্বামী । পুরুষের কাছে নারী যেন গবাদি পশু, গরুকে মারার লাঠি দিয়ে হামিদাকে শেষ বিদায় দেয় স্বামী যার এতদিন ক্ষমতা হয়নি স্ত্রীকে অধিকার দেওয়ার । অর্থাৎ সমাজের পুরুষ জাতি ; কি উঁচু শ্রেণি কি নিচু শ্রেণি সবাই নারীদেরকে নানারকম বিধানের ভয় দেখিয়ে নানাভাবে শাসন-শোষণ ও ব্যবহার করেছে বাজারের সামগ্রী হিসাবে ।

বাংলাদেশের অন্যতম মহিলা ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেন ১৯৪৭ সালের ১৪ জুন বাংলাদেশের রাজশাহী শহরে জন্মগ্রহণ করেন । তাঁদের আদি নিবাস লক্ষ্মীপুর জেলার হাজিরপাড়া গ্রামে হলেও তাঁদের গ্রামে বেশিদিন থাকতে হয়নি । তাঁর পিতার নাম এ কে মোশাররফ হোসেন এবং মা ছিলেন মরিয়ামুন্ননেছা বকুল । সেলিনা হোসেন তাঁর সাত ভাই-বোনের মধ্যে চতুর্থ । ১৯৫৪ সালে বগুরার লতিফপুর প্রাইমারি স্কুলে

ভর্তি হন এবং ১৯৫৯ সালে রাজশাহীর নাথ গার্লস স্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হন । ১৯৬২ সালে তিনি এস এস সি অর্থাৎ মাধ্যমিক পাশ করেন । পরে ১৯৬৪ সালে রাজশাহী মহিলা কলেজে ভর্তি হন । কলেজের পর তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে বি.এ অনার্স পাশ করেন এবং এম.এ পাশ করেন । ১৯৭০ সালে বাংলা একাডেমীর গবেষণা সহকারী হিসাবে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় এবং ২০০৪ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন । পরে ২০১৪ সালে বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর চেয়ারম্যান হিসাবে নিযুক্তি পান ।

সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ অবদানের জন্য তিনি ১৯৮০ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার পান, ২০০৯ সালে একুশে পদক এবং ২০১০ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানিত ডি.লিট উপাধি পান । এছাড়াও তিনি দক্ষিণ এশিয়ার সাহিত্য ক্ষেত্রে অভূত অবদানের জন্য ২০১৫ সালে SAARC Literary Award পান । তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য রচনা হল – 'জলোচ্ছ্বাস' (১৯৭৩), 'হাঙর নদী গ্রেনেড' (১৯৭৬), 'যাপিত জীবন' (১৯৮১), 'পোকামাকড়ের ঘরবসতি' (১৯৮৬), 'কাঁটাতারে প্রজাপতি' (১৯৮৯), 'কালকেতু ও ফুল্লরা' (১৯৯২), 'ঘুমকাতুরে ঈশ্বর' (২০০৪), 'ভূমি ও কুসুম' (২০১০), 'আগস্টের একরাত' (১০১৩), 'গেরিলা ও বীরাঙ্গনা' (২০১৪), 'দিনকালের কাঠখড়' (২০১৫) ইত্যাদি । এছাড়াও গল্প-কবিতা ও শিশু সাহিত্যে তাঁর অবাধ প্রতিভা লক্ষ করা যায় । আমাদের এই পর্বের আলোচ্য উপন্যাস *'ঘুমকাতুরে ঈশ্বর'* ।

দুঃখ জর্জরিত, না খেতে পাওয়া, জীবনের চাহিদার সাথে লড়াই করা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ধর্মের রুক্ষ হাতছানি ও এই অনাকাঙ্খিত হাতছানি কিভাবে তাদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছে তার অন্যতম দৃষ্টান্ত সেলিনা হোসেনের 'ঘুমকাতুরে ঈশ্বর' উপন্যাসের চরিত্ররা । ধর্ম মানুষের স্বার্থে মানুষের প্রয়োজনে এলেও সেই ধর্ম কীভাবে সমাজের পুঁজিপতিদের, ধর্মীয় পান্ডাদের শোষণের হাতিয়ারে পরিণত হয় তার নিদর্শন এই উপন্যাস । প্রাচীন কাল থেকেই ধর্মের কঠোর নাগপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা নারী সমাজ । শিক্ষিত বা অশিক্ষিত, ধর্মের কুচক্রী রক্ষক বা সাধারণ মানুষ সকলের ঠান্ডা মাথার সিদ্ধান্তের বা হুজুগের শিকার হতে হয়েছে নারী সমাজকে ।

এই ধর্মীয় নেতাদের স্বার্থলোভী সিদ্ধান্ত ও সুবিদ আলির সিদ্ধান্তের শিকার হয়ে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে সেলিনা হোসেনের অন্যতম নারী চরিত্র মহকী বেগমকে ।

সুবিদ আলী একজন পুলিশ । গ্রাম রক্ষা করা তার দায়িত্ব । দুঃখ-দারিদ্রের মধ্যে তার মেজাজটা সবসময় বিগড়ে থাকে । যখন তার মন মেজাজ খুব খারাপ থাকে, তখন তার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে বউয়ের উপর । আর অকারণে সবচেয়ে খারাপ শব্দ তিন তালাক বলে বউয়ের উপর অবিচার করে --

> *"..... সুবিদ আলীর মন মেজাজ খুব খারাপ থাকে, নিজেকে সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে, তখন তার সব রাগ গিয়ে পড়ে বউয়ের ওপরে, আর সবচেয়ে খারাপ শব্দটি বলে বউয়ের ওপর অবিচার করে, অকারনে তিন তালাক বলা হয়ে যায় ।"* (১১৩)

কিন্তু তিন তালাক বলার পর অনুতাপে, কষ্টে ম্রিয়মান হয়ে থাকে সুবিদ আলি । লজ্জায় বউয়ের সামনে যেতে পারেনা, কারণ তালাক দেবার মত কোনো দোষ মহকী বেগম করেনি । পুরুষ-শাসিত সমাজে বরাবরই লাঞ্ছিত হতে হয়েছে নারীকে । অকারণে তাকে 'তালাক' শব্দ শুনতে হয়েছে । পুরুষের মন-মেজাজ নির্ধারণ করে নারীদের ভাগ্য, ভবিষ্যত জীবন । নারী হয়ে থেকেছে পুরুষের হাতের পুতুল, যখন যেভাবে নাচাবে তখন সেভাবে নাচবে । নাচতে না পারলে নারীর ভাগ্যে জোটে পুরস্কার-স্বরূপ তালাক । অর্থাৎ তালাক যেন বাজারের সস্তা বস্তু -- যখন তখন তার প্রয়োগ করা যায় । বরাবরই এই তালাক প্রথার শিকার হয়েছে নারীরা, তবে কি পুরুষ ভুল করে না ; তারা কেন তালাক পায় না ? পুরুষ-শাসিত সমাজের বিরুদ্ধে গিয়ে রোমেলা যখন স্বামী স্বপনের অবিচারের প্রতিবাদ করে, তখন আবার এই স্বার্থপর লোভী সমাজের প্রতিনিধি হয়ে রোমেলার মা লুৎফুন্নেসা আঁতকে ওঠে মেয়ের কথায় --

> *"মুই নিজে ফতুয়া দিলাম যে আজ থাইকা মোর বিয়ার সম্পর্ক শ্যাষ । অরে মুই তালাক দিলাম । এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক।"* (১১৪)

লুৎফুন্নেসা অবাক নয়নে চেয়ে থাকে মেয়ের সাহস দেখে । অসহায়ত্ব তাকে তাড়িয়ে বেড়ায় । মেয়ের ভবিষ্যত নিয়ে মায়ের চিন্তা হয় --

> *"এই মেয়ে নিয়ে কি করবে ও ? আর কেউ কি ওকে বিয়ে করবে ?"* (১১৫)

এভাবে সুদুর অতীতকাল থেকে সমাজের রক্ষচক্ষু দর্শনে ভীত হয়ে আসছে নারী সমাজ । পুরুষ যখন অবিচার করে তখন তাতে দোষ হয়না, কিন্তু নারী করলেই দোষ । সমাজের প্রচলিত এই দুর্গপ্রাচীর ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে রোমেলা, কিন্তু এই স্বার্থপর সমাজ স্বীকার করে কি নারীর এই দুঃসাহসিকতা ? যদি স্বীকার করত তবে মা লুৎফুন্নেসার চিন্তা থাকত না , থাকত না মেয়ের ভবিষ্যত নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন ।

ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে স্বভাবে বা অভাবে চিরকাল তালাক প্রথার শিকার হতে হয়েছে নারীদের । নারী জীবনে তালাক প্রথার পরিণতি বাস্তবতার রঙে সমাজের চিত্রপটে নিপুণভাবে অঙ্কন করেছেন ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেন । পুরুষ-শাসিত সমাজে ধর্মীয় প্রথার অপব্যবহার কীভাবে নারীজীবনকে কুড়ে কুড়ে খায় তার দৃষ্টান্ত মহকী বেগম । অকারণে তালাকপ্রাপ্ত মহকী বেগমের নিজস্বতা বলে কিছু থাকে না । চৌত্রিশ বছরের সংসার জীবনে তাকে পেতে হয়েছে লাঞ্ছনা, হার মানতে হয়েছে তাকে দারিদ্রতার কাছে, সমাজের কাছে, স্বামীর কাছে । স্বামীর কাছে তাকে হতে হয়েছে বর্জ্য পদার্থ । প্রয়োজনে কাছে টেনেছে আবার মন হলেই তালাক দিয়েছে । সুবিদ আলীর কাছে তালাক হচ্ছে খেলার বস্তু । এ নিয়ে সে দু-দুবার তালাক দিয়েছে মহকী বেগমকে । দ্বিতীয়বার তালাক দেবার পর থানার দারোগাবাবু মহকী বেগমকে বিয়ের প্রস্তাবের কথা বললে সুবিদ আলী বলে ওঠে --

> *"মুই বউ তালাক দিমু । হিল্লা বিয়ে অবে । মোরা আবার ঘর করমু, কোনো শালার বেটার ভাত খাইনা, কোনো শালার বেটার ধার ধারিনা ।"* (১১৬)

হিল্লা বিয়ে ! এই হিল্লা বিয়ে যে একজন নারীর কাছে কতটা কঠিন তা জানে মহকী বেগম । তাই সে পুরুষের প্রয়োজনে হিল্লা বিয়ের মাধ্যমে অপর পুরুষের খাবার হতে চায় না, চায় না সে নিজের দেহটাকে শকুনের মতো ছিঁড়ে খেতে দিতে --

> *"..... মহকী বেগম হিল্লা বিয়েতে রাজি ছিল না, বিয়ে মানে আর একজন পুরুষ তার শরীরের উপর হামলে পড়বে, যাকে ও কখনো স্বামী হিসেবে মানতে পারবে না । পর পুরুষের হাতে নিজের শরীরটা ছিঁড়তে দিতে রাজি ছিল না । বিয়ে মানে ধর্ম সম্মত সহবাস, উহ, কি জঘন্য, সেই সহবাসের পরে আবার তালাক, তারপরে স্বামীর সংসারে ফিরে আসা ..... মহকী বেগমের মাথা চক্কর দেয় ।"* (১১৭)

কিন্তু অপরপক্ষে সুবিদ আলীর কাছে তালাক যেন সস্তা, হিল্লা বিয়ে সস্তা, নারীর যন্ত্রণা সস্তা, সস্তা নারীর দেহ-মনুষ্যত্ব-আবেগ -- কারণ হিল্লা বিয়ে তো মহকীকে করতে হয়, পুরুষকে নয় । এই ক্ষেত্রে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ধর্মের রক্ষকদের মাথা কাজ করে না । তারা শুধু জানে নারীর ওপর অত্যাচারের পাথর চাপিয়ে দিতে । তারা বলে না সুবিদ আলী কেন তুমি বারবার বিবিকে তালাক দাও ? এর বছর দুই আগেও সুবিদ আলী মহকী বেগমকে রাগের মাথায় তালাক দেয় । তারা বলে বিবিকে পাবে হিল্লা বিয়ের মাধ্যমে --

> *"বছর দুয়েক আগে সুবিদ আলী রাগের মাথায় মহকী বেগমকে আর একবার তালাক দিয়েছিল । কিছুদিন আগে সুবিদ আলী মহকীকে সংসারে ফেরত চাইলে গ্রামের মোড়লরা প্রবল আপত্তি করেছিল । বলেছিল, হিল্লা বিয়ে ছাড়া তোমরা আর সংসার করতে পারবে না ।"* (১১৮)

অর্থাৎ ধর্মের রক্ষক বা মোড়লদের কাছে মহকী বেগমের পুরুষের কাছে হাতবদল যেন দ্রৌপদির বস্ত্রহরণের মতোই আনন্দদায়ক । তারা শুধু আনন্দ পেতে চায়, ভোগ করতে চায় নারীকে, তার কষ্টকে বুঝতে চায় না ।

ইসলাম ধর্মে তালাক প্রথা থাকলেও তার কিছু নিয়ম বা পর্যায় আছে যা মহকী বেগম জেনেছিল । মহকী বেগমের কথায় --

> *"মুখে মুখে তালাক তো তালাক না । নূরজাহান আপা কইছে মুখে মুখে তালাক কইলে তালাক অয়না ।"* (১১৯)

তালাক প্রথার প্রকৃত সত্যতাকে ধামাচাপা দিয়ে ধর্ম নিয়ে ব্যবসা চালাচ্ছে ধর্মের রক্ষকরা । আর মহকী বেগমের মত দু'পাতা জানা সাধারণ মানুষ প্রতিপদে পদপৃষ্ট হচ্ছে ধর্মের অপব্যবহারকারী স্বার্থপর ধার্মিকদের কাছে । তাদের কাছে ধর্ম হল নরম কাদা মাটির ঢেলা, যখন যেভাবে যেরকম দরকার তখন সেখানে সেভাবে ধর্মের আকৃতি দিয়ে মানুষকে শোষণ করে । হিল্লা বিয়ের নামে নারীকে ভোগ করার সুযোগ খুঁজে বেড়ায় ধর্মের ধ্বজাধারী তথাকথিত ধর্মের রক্ষকরা । সাধারণ মানুষ ধর্মের প্রকৃত সত্যতাকে তুলে ধরার চেষ্টা করলে তারা শাসায়, ভয় দেখায়, ফতোয়া দেয় --

> *"মোড়লরা বকাবকি করেছে সুবিদ আলীকে । বলেছে, তোমার বউ বেশরম আওরাত অইয়া গেছে । ওরে মোরা জ্যান্ত পুঁইতা রাইখা শকুন দিয়া খাওয়ামু । ..... মোরা ফতোয়া দিলাম হিল্লা বিয়া বাদে তোমার বউ তোমার সংসারে ফিরা যাইতে পারবেনা ।"* (১২০)

অর্থাৎ মোড়লদের কথা শুনে হিল্লা বিয়েতে রাজি হলে মানুষরূপী শকুন নারীকে খাবে আর তাদের কথা না শুনলে আকাশের শকুন খাবে । আসলে এটা নারীকে ভোগ করার কৌশল মাত্র ।

তালাক দেবার পর সুবিদ আলী মহকী বেগমকে ফিরে পেতে চাইলে মহকী বিয়েতে রাজি না হলে সুবিদ আলী বিচারের আশায় পৌর-আদালতে যায় । পৌর-আদালত তাদের একসাথে থাকার অনুমতি দিলেও মোড়লরা তা মানেনা --

"সুবিদ আলী পৌর-আদালতে যায় । অনেক ঘুরাঘুরি করারা পর আদালতের রায় বের করে । আদালত স্বামী-স্ত্রীকে একসঙ্গে বসবাস করার অনুমতি দেয় । কিন্তু গাঁয়ের মোড়লরা সেই রায় মানে না ।" (১২১)

সুবিধাবাদী ধর্মের রক্ষকদের হাতে প্রতিনিয়ত লাঞ্ছিত হচ্ছে মহকী বেগমেরা আর তাদের সৃষ্ট ধর্মের চাকায় পিষ্ট হয়ে রক্তাক্ত হচ্ছে ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ ।

কিন্তু দ্বিতীয়বার সুবিদ আলী মহকীকে তালাক দিলে মহকী বেগম আর হিল্লা বিয়ের মাধ্যমে সুবিদ আলীর ঘরে আসতে চায়না । তার মনে পড়ে যায় প্রথম তালাকের পর তার হিল্লা বিয়ের কথা --

"শেষ পর্যন্ত সকলের অনুরোধে হিল্লা বিয়েতে রাজি হয়েছিল মহকী । ওই এক রাতই মাত্র, তারপর পালিয়ে এসেছিল হামিদ আলীর বাড়ি থেকে । সুবিদ আলী মোড়লদের ধরে তালাকের ব্যবস্তা করে ঘরে তুলেছিল মহকী বেগমকে । হামিদ আলীর সঙ্গে এক রাতের সহবাস এখনও তার জীবনে বিচুটির জ্বালা, ... লোকটা নরকের কীট । বলেছিল তোমার সাথে আজ মোর বেহেশতের রাত । ... ফুঁ দিয়ে কুপিটা নিভিয়ে দেয় । দরজাটা আগেই বন্ধ করা হয়েছে । হেঁচকা টানে তাকে বিছানায় আনে, ... যেন মহকীর হাতটা মুড়মুড় শব্দে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হবে । ও কঁকায় না ..... হামিদ আলী ওকে পদানত করে । তারপর রাতভর ।" (১২২)

এভাবে পুরুষের কাছে পদানত হয়ে চলেছে নারীসমাজ । এভাবে কারও ভুলের শিকার হতে হয় অন্যকে, বয়ে বেড়াতে হয় অন্যের অন্যায়ের বোঝা ।

রাগের বশে তালাক দিলেও সুবিদ আলী ভালো মনের মানুষ, ভালোবাসে মহকীকে । সে অনুতপ্ত । সে তো মন থেকে তালাক দেয়নি । তবে কেন শুধুমাত্র

তিনটি 'তালাক' শব্দে ভেঙ্গে যায় চৌত্রিশ বছরের ভালোবাসার সংসার । সুবিদ আলী সমাজের এই প্রচলিত প্রথার বিরোধীতা করে --

> *"আল্লাহর কসম, মুই মন থাইকা কোনো তালাক দেয়নি । মন থাইকা তালাক না দিলে তালাক অইবে কেনরে ?"* (১২৩)

তাই সে মেয়ে চাঁদনিতারাকে তেজের সঙ্গে বলে --

> *"ফতোয়া বেডারা অইলে কইবা মোর বাজান আর মায়ে একলগে বেড়াইতে গেছে । আপনেগো ফতোয়া হেরা মানেনা ।"* (১২৪)

এভাবে সমাজের তথাকথিত ধার্মিক ব্যক্তিরা, ধর্মের রক্ষকরা নিজেদের প্রয়োজনে, নিজেদের স্বার্থে ধর্মকে নতুন মোড়কে মুড়ে নিজের পছন্দমত রঙ লাগিয়ে সমাজের সাধারণ শ্রেণিকে বিশেষত নারীদের শোষণ করে চলেছে । এক্ষেত্রে মানুষের স্বার্থে, মানুষের অধিকার রক্ষার্থে তাদের শুভ ধর্মবুদ্ধি কাজ করে না ।

ঔপন্যাসিক শামিম আহমেদ ১৯৭৩ সালে মুর্শিদাবাদ জেলার এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । ছোটবেলায় লেখাপড়া গ্রামের স্কুলেই হয় এবং পরে প্রেসিডেন্সী কলেজে । তিনি দর্শন বিষয়ে অধ্যাপনায় নিযুক্ত । পরবর্তীকালে তিনি কলকাতায় বসবাস করেন । তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা বারো । তাঁর রচনায় তিনি কল্পকথার বুননে ফুটিয়ে তোলেন বিষন্নতা এবং নির্মম সত্যকে । *'বিষাদ বিন্দু'* (২০১৩) উপন্যাসটি সপ্তম শতাব্দীতে সিরিয়ায় নবীর মৃত্যুর পর খলিফা পদ নিয়ে যে বিরোধ দেখা দেয় সেই পটভূমিতে লেখা । এজিদ বা ইয়াজিদ ইসলামিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হলেও সে ইসলাম বিশ্বের 'কলঙ্ক' নামে খ্যাত । কিন্তু লেখকের চোখে এজিদ অন্যভাবে ধরা দেয় । তাই উপন্যাসটির প্রচ্ছদে বলা হয়েছে --

> *"হাসানকে গোপনে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করে এজিদ । ..... এজিদ কি সত্যি খুব খারাপ লোক ছিলেন ? তিনি কি কাফের ? এজিদের কোন জীবনী নেই । পাওয়া যায় না তাঁর কবরের খোঁজও । অথচ ইতিহাসে তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র । ..... প্রেমিক*

এজিদ, পিতা এজিদ, যোদ্ধা এজিদ বেহালায় ছড় টেনে কাঁদেন । কেন ?" (১২৫)

ঔপন্যাসিক এজিদকে এক অন্য মাত্রায় নিয়ে যেতে চেয়েছেন । মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ সিন্ধু' উপন্যাসে এজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঘাতক ও শয়তান রূপে, কিন্তু লেখক তাকে তুলে ধরেন একজন পিতা হিসাবে, প্রেমিক হিসাবে । ঠিক যেমন বাল্মীকির 'রামায়ণে' রাবণ দুষ্ট চরিত্র হিসাবে স্থান পায় । আবার এই একই রাবণ মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ বধ' কাব্যে স্থান পায় একজন শাসক হিসাবে, পিতা হিসাবে । তাই উপন্যাসটির কথামুখে যথার্থই বলা হয়েছে --

"মুসলিম বিশ্বে এজিদ হলেন 'ঘাতক', 'শয়তান', 'কাফের' । মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ সিন্ধু' এজিদ বিষয়ক একটি চিত্র তুলে ধরে । অমর উপন্যাস 'বিষাদ সিন্ধু'-কে বাঙালি মুসলমান ইতিহাসের মর্যদা দেন । ..... 'বিষাদ বিন্দু' এজিদের অন্য চরিত্র তুলে ধরেছে । সুরা-সঙ্গীত-নারীর পাশাপাশি তাঁর একটি মানবিক মুখের সন্ধান করা হয়েছে, যে মুখমণ্ডল 'বিষাদ সিন্ধু'-র এজিদের মতো দানবীয় নয় ।" (১২৬)

'বিষাদ বিন্দু' উপন্যাসটি ৬৪৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৬৮৩ খ্রিষ্টাব্দ সময়কালের ঘটনাপ্রবাহে লেখা । হযরত মহাম্মদের মৃত্যুর পর থেকেই নারীর অবস্থানের অবনতি ফুটে উঠেছে উপন্যাসটিতে । নারীরা যে চিরকালই সমাজে অবহেলিত, পুরুষের যৌনতা চরিতার্থের পুতুল তাই ফুটে ওঠে উপন্যাসটিতে । 'বিষাদ বিন্দু'তে আমরা দেখতে পাই গর্ভবতী মইসুন বিবি পুত্র সন্তান এজিদের জন্ম দেয় যার পিতা অর্থাৎ মাবিয়া মইসুনের রূপে মগ্ন হয়ে তাকে বিয়ের কয়েকদিন পরেই তালাক দেয় । যার ফল এই পিতৃহীন এজিদ --

"মইসুন বিবির মনে পড়ে যায় হজরত মাবিয়ার সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের কথা । তিনি হয়ত জানেনই না যে তাঁর পুত্র সন্তান

হয়েছে । মাবিয়া তাঁকে বলেছিলেন, মহানবি হজরত মহম্মদ নাকি ভবিষ্যৎবাণী করে গিয়েছেন, মাবিয়ার পুত্রকে দুনিয়ার অর্ধেক লোক ভয় পাবে । মাবিয়া তাই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তিনি বিয়েই করবেন না । কিন্তু মইসুনের রূপে তিনি আর শপথ রক্ষা করতে পারেননি । লোক-জন জানতো, মাবিয়ার এক দুরারোগ্য ব্যাধি হয়েছে আর তাই তিনি হেকিমের পরামর্শ মতো বিয়ে করেছেন । বিয়ের কয়েকদিন পরেই তো তাঁদের তালাক ।" (১২৭)

অর্থাৎ এ যেন ক্ষুধা মেটানোর লোভনীয় খাবার, পেট ভর্তি হলে বাকি আর কী দরকার, ফেলে দাও ।

আবার একইভাবে লেখক উপস্থাপন করেছেন চরিত্র এজিদকে । ছোটবেলা থেকেই সে খুব জেদী আর একরোখা । যখন যা মনে হয়েছে তখন তাই করেছে সে । পিতা মাবিয়ার প্রাসাদে গিয়ে সালেহাকে দেখে সে বিয়ে করতে চাইলে পিতা তাকে বাধা দেয় কারণ সালেহা তার বোন । কিন্তু এরপর এজিদ উম্মে হিশাম, কুলসুম, রামালাকে একের পর এক বিনা কারণে শুধুমাত্র রূপের কারণে বিয়ে করলেও কেউ তাকে কোনো বাধা দেয়নি ; প্রথম স্ত্রী উম্মে হিশামও না --

"আবদুল্লাহ-র কন্যা কুলসুমকে তার ভারি পছন্দ । উম্মে হিশামও নিমরাজি হয়েছেন । কুলসুমকে বিয়ে করে যদি এজিদের মতি স্থির হয়, তা হলে তো ভালো কথা ।" (১২৮)

এরপরও এজিদের মন শান্ত হয় না সে জয়নাবকে চায় । সে টাকার লোভ দেখিয়ে আবদুল জব্বারকে তার নিরপরাধ স্ত্রী জয়নাবকে তালাক দেওয়ায় তাকে বিয়ে করার জন্য । এবং এর বদলে জব্বারকে তার বোন সালেহার সাথে বিয়ে দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয় --

"জয়নাবের সঙ্গে আবদুল জব্বারের তালাকনামা লেখা হয়ে গেল । কিন্তু সালেহা বেঁকে বসলেন । যিনি টাকার লোভে নিরপরাধিনী

স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারেন, তাঁর সঙ্গে সালেহা বানু বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে রাজী নন ।" (১২৯)

এখানে আমরা দেখতে পাই ইসলামি পিতৃতান্ত্রিক আইনের বলে আবদুল জাব্বার বিনা কারণে টাকার লোভে স্ত্রীকে তালাক দেয় । আবার এজিদও নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য বোন সালেহাকে তার মতের বিরুদ্ধে আবদুল জব্বারের সাথে বিয়ে দিতে চায় । নারী যেন তাদের কাছে কেনাকাটার জিনিস, বিনিময়ের মাধ্যম ।

এজিদ শুধুমাত্র সুন্দরী মেয়েদেরই নয়, পরস্ত্রীকেও ছলনার আশ্রয় নিয়ে বিয়ে করতে চায়, যা ইসলামে অবৈধ । এছাড়াও সে যখন যাকে ভালো লেগেছে তার সাথে যৌনতায় লিপ্ত হয়েছে । লোকজন বলাবলি করে --

"কুলসুমকে বিয়ে করেও এজিদের মতি স্থির হয় না । সে এখন এমন এক নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, যা ইসলামে হারাম । এজিদের তিনটি পুত্র রয়েছে বাড়িতে । ..... এছাড়া দাসীদের গর্ভেও তার বেশ কয়েকটি পুত্র সন্তান হয়েছে ।" (১৩০)

বহু চেষ্টার পরও এজিদ জয়নাবকে না পেলে পিতার কথামতো যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে । সেখানে গিয়েও সে বাবেলের রাণীর প্রস্তাবে তার মেয়ে রামালাকে বিয়ে করে --

"রাজনৈতিক কারণেই উম্মে রামালাকে বিয়ে করতে চায় এজিদ । ..... মৌলবি 'কলমা' পড়িয়ে উম্মে রামালাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করলেন । সেই দিনই রামালার সঙ্গে এজিদের শাদি-মুবারক সম্পন্ন হল ।" (১৩১)

কিন্তু এজিদ এতগুলো যৌন পুতুলকে বিয়ে করেছে শুধুমাত্র কাম চরিতার্থ করার জন্য, কখনো ভালবাসেনি তাদের, যা বিন জাবেলার প্রতি এজিদের কথায় স্পষ্টই বোঝা যায় --

"তোমাকে আমি ভালোবাসি, রাজকুমারী । আমার কবি-বন্ধু আখতাল বলে, যাকে ভালবাসবে তাকে বিয়ে করো না । জয়নাবের নাম শুনেছ তুমি ? জয়নাবকে আমি ভালোবেসেছিলাম । হাসানের মৃত্যুর পর কি আমি তাকে বলপূর্বক বিবাহ করতে পারতাম না ! আমি তা করিনি ।" (১৩২)

এভাবেই এজিদের মতো ভণ্ড মুসলিমের অভাব নেই আমাদের এই সমাজে যারা নারীকে ব্যবহার্য সামগ্রীতে পরিণত করেছে এবং যা আমাদের সমাজের চোখে কালোপট্টি বাঁধা ধর্মের রক্ষকদের চোখে পড়ে না, অত্যাচারিত হতে দেয় নারীদের নিজেদের প্রভুত্ব কায়েম রাখার জন্য ।

আরবি শব্দ 'নিকাহ্'-র বাংলা প্রতিশব্দ বিয়ে ধরা হয় । তবে 'নিকাহ্' বিয়ে এবং বিয়ের পরে সঙ্গমের অর্থই প্রকাশ করে । তবে এই সঙ্গম বিয়ে ছাড়া নয় । মানুষ সামাজিকভাবে বসবাস, বংশবৃদ্ধি এবং নিজের মন এবং শরীরের চাহিদা মেটানোর জন্য যে সঙ্গীর দরকার, সামাজিকভাবে সমর্থিত পদ্ধতিতে সেই সঙ্গীর সাথে বসবাসের যে চুক্তি তাকেই সাধারণভাবে বিয়ে বলে । এই চুক্তি করার জন্য দু'জনেরই সম্মতি থাকা বাধ্যতামূলক । কেননা পৃথিবীর কোনো চুক্তিই সম্মতি ছাড়া হয় না । তবে 'কুরআন' অনুযায়ী ইচ্ছে হলেই বিয়ে করা যায় না । নিজের সামর্থ প্রয়োজন । সূরা নূরের ৩৩ নং আয়াত অনুযায়ী যাদের সামর্থ নেই তারা সামর্থ অর্জন করা পর্যন্ত সংযম (রোজার মাধ্যমে করা যেতে পারে) করে চলে । এই চুক্তি করার সময় এবং বিয়ের পর নানারকম সমস্যা দেখা দেয় । এই সমস্যাগুলো মুসলিম সমাজে কতভাবে দেখা দিতে পারে তা আমরা উপরিউক্ত উপন্যাসগুলিতে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি । এখন দেখার বিষয় যারা ধর্মগ্রন্থের কথা বলে এই সমস্যাগুলি সৃষ্টি করছে সেটা ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী সঠিক না নিজের বানানো ।

আমাদের আলোচিত উপন্যাসগুলির অনেকগুলিতে বিয়ের সময় মেয়েদের মতের কোনো দামই দেয়নি । কিন্তু 'কুরআন' হাদীস অনুযায়ী মেয়েদের 'এজিন' (সম্মতি) ছাড়া কেউ বিয়ে দিতে পারবে না । আবূ দাউদ শরীফে ইবনে আব্বাসের বর্ণনা থেকে

জানা যায় – 'একজন প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে নবীকে এসে বলল যে তার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও বাবা তাকে জোর করে বিয়ে দিয়েছে । নবী তাকে সেই বিয়ে ভাঙার অনুমতি দিয়েছেন' । এই একই রকম আরও অনেক ঘটনা আবূ হোরায়ারার বর্ণনা থেকে জানা যায় নারীর সম্মতি ছাড়া বিয়ে হলে তা সিদ্ধ নয় । এরপরেও আমরা দেখি মেয়েদের জোর করে মতের বিরুদ্ধে ভয় দেখিয়ে বিয়ে দেওয়া হয় । এই বিয়ের পদ্ধতি ইসলাম অনুগামীদের নয় । কিন্তু দুঃখের কথা যারা জোর করে বিয়ে দেয় বা করে তারাই আজ ইসলামের বড় অনুসারী । তবে তারা মুখোশধারী, নিজের দোষ ঢাকতেই মুখে ধর্মের কথা বলে । যেমন – 'ফুলবউ' উপন্যাসে নিসার রাজিয়াকে তার মতের বিরুদ্ধে গিয়ে বিয়ে করে ।

এছাড়াও এই সমাজের স্বার্থলোভী মানুষরা নিজেদের কামনা-বাসনা মেটানোর জন্য একের অধিক বিয়ে করতে থাকে এবং এখানেও চলে ধর্মের বুলি । কিন্তু সূরা নিসার ৩ নং আয়াতে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে --

> *"আর যদি তোমরা এতিমদের (মেয়েদের) সাথে বেইনসাফী করার ব্যাপারে ভয় করো, তাহলে যে সব মেয়েদের তোমরা পছন্দ করো তাদের মধ্যে থেকে দুই, তিন, বা চার জনকে বিয়ে করো । কিন্তু যদি তোমরা তাদের সাথে ইনসাফ করতে পারবে না বলে আশংকা করো, তাহলে একজনকেই বিয়ে করো । অথবা তোমাদের অধিকারে যেসব মেয়ে আছে তাদের বিয়ে করো । বেইনসাফীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এটিই অধিকতর পদ্ধতি ।"* (১৩৩)

সূরাটি ওহোদের যুদ্ধের সময় পাঠানো হয় । সেই সময় একের পর এক যুদ্ধ লেগেই থাকত । সেই যুদ্ধে গিয়ে অনেকেই মারা যেত । যাদের বাবারা মারা যেত সে পিতৃহীন মেয়েদেরকে বিয়ে করার কথা বলা হয়েছে এবং চারটি পর্যন্ত করার কথা বলা হয়েছে । তবে প্রথম শর্তই ছিল যদি সবার সাথে সমান ব্যবহার করতে পার, যদি সমস্যা সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে তবে একটি বিয়েই উত্তম ; একের বেশি বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে । এই সূরার ১২৯ নং আয়াতে আবার বলা হয়েছে --

"স্ত্রীদের মধ্যে পুরোপুরি ইনসাফ করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয় । তোমরা চাইলেও এ ক্ষমতা তোমাদের নেই । কাজেই (আল্লাহ্‌র বিধানের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য এটিই যথেষ্ট যে) এক স্ত্রীকে একদিকে ঝুলিয়ে অন্য স্ত্রীর প্রতি ঝুঁকে পড়বে না ।" (১৩৪)

এই আয়াত থেকে পরিষ্কার কখনোই দুই স্ত্রীর মধ্যে দুই রকম ব্যবহার করা যাবে না । এবং মানুষ কখনো সবার প্রতি একরকম ব্যবহার করতে পারে না । আর না পারলে এক বিয়ে করাই উত্তম । এছাড়াও যদি এমন কোনো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে একের বেশি বিয়েই সমাধানের অস্ত্র ও এতে কারো কোনো ক্ষতি হচ্ছে না এবং 'কুরআন'-এর শর্ত অনুযায়ী সবার সাথে সমান ব্যবহার করতে পারবে তবেই কেউ একের অধিক বিয়ে করতে পারবে । হাদীস, 'কুরআন'-এর কোথাও উল্লেখ নেই যে এক বিয়ে করেছে আর যে একের অধিক বিয়ে করেছে সে বেশি ভালো মুসলিম । বরঞ্চ যে স্ত্রীর অধিকার সঠিকভাবে পালন করে সে-ই উত্তম মুসলিম এবং এটার জন্যও একটি বিয়েই উত্তম । কিন্তু আমাদের উপন্যাসের চরিত্ররা যেমন -- 'পদ্মরাগে' চাচা লতীফের হওয়া বিয়ে জয়নবের সাথে লতীফ চাইলেও হতে দেয়নি, নিসার ('ফুলবউ'), গোধু প্রধান, করিম বকস ('সূর্যদীঘল বাড়ী'), পীর দরবেশ ('সংশপ্তক'), মজিদ ('লালসালু'), বদুপীর ('অলীক মানুষ'), সোভান ('দ্বিতীয় বিবি'), এজিদ ('বিষাদবিন্দু') প্রভৃতি চরিত্ররা বিনা কারণে শুধুমাত্র নবীর সুন্নাতের নামে একের বেশি বিয়ে করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে । নবী যা করেছে তা নবীর সুন্নত (হযরত মুহাম্মাদ এর আচরিত পদ্ধতি) নয় – নবী যে পরিস্থিতিতে যে কাজ করেছেন সেই পরিস্থিতিতে যদি সে কাজ অন্য কেউ করে তবেই তা সুন্নত হবে । অর্থাৎ এখানে যারা একের বেশি বিয়ে করেছে তারা কেউ ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী করেনি, শুধু জোর করে নারীকে অত্যাচার করেছে মাত্র ।

দু'জন নারী-পুরুষ যখন একসাথে থাকার জন্য সামাজিকভাবে চুক্তিবদ্ধ হয় তখন তাকে বিয়ে বলে । আর একসাথে থাকার চুক্তির পর যদি তাদের একসাথে থাকতে সমস্যা দেখা দেয় যে সমস্যা একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন না হলে সমাধান হয় না, এই বিচ্ছিন্ন হওয়াকেই তালাক বা বিচ্ছেদ বলে । মনে রাখতে হবে পারিবারিক

জীবনে ভাঙন ও বিপর্যয় অত্যন্ত মর্মান্তিক ব্যাপার । তালাক এই ভাঙনের চরম পর্যায় । পারিবারিক জীবনে এই বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষার জন্য এবং স্বামী-স্ত্রীর অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে ইসলামে তালাক প্রথার ব্যবস্থা করা হয়েছে । সাংসারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ ও অসামঞ্জস্যতা যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায় এবং সুখী শান্তিপূর্ণ জীবন যখন কোনভাবেই সম্ভব হয়ে ওঠে না তখন পারস্পারিক সম্পর্ক হয়ে ওঠে তিক্ত ও বিষণ্ণ ; একে অপরের প্রতি হয়ে ওঠে বিমুখ এবং তাদের শুভ মিলনের কোনো পথ আর খোলা থাকে না, তখনই একমাত্র এই সম্পর্কের চূড়ান্ত পর্যায় তালাক প্রথা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ইসলামে । তালাক হল নিরুপায়ের উপায় । অর্থাৎ সুখী ও সামঞ্জস্যতা বজায় রেখে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে জীবন যাপন যখন অসম্ভব হয়ে পড়ে তখন সুস্থ ও ঠাণ্ডা মাথায় তালাক দেওয়ার কথা বলা হয়েছে ।

সূরা নিসায় বলা হয়েছে --

> *"যদি তারা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় হয়, তাহলে হতে পারে একটা জিনিস তোমরা পছন্দ করোনা কিন্তু আল্লাহ্ তার মধ্যে অনেক কল্যাণ রেখেছেন ।"* (১৩৫)

এই আয়াতের ব্যাখ্যানুযায়ী বলা যায় তালাক তাড়াহুড়া করে দিতে নিষেধ করা হয়েছে । যদি একে অপরকে অপছন্দ হয় বা কারো কোনো ব্যবহার খারাপ লাগে তবে সঙ্গে সঙ্গে তালাক দিতে নিষেধ করা হয়েছে । এর জন্য অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে । স্বামী বা স্ত্রী যার দোষ থাকুক না কেন তাকে সুযোগ দিতে হবে দোষ শুধরানোর । হয়ত সে সময় পেলে ত্রুটিমুক্ত হবে বা ধীরে ধীরে মানিয়ে নিতে পারবে । অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো সমস্যা দেখা দিলে তা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে । সমস্যার সমাধান শুধুমাত্র তালাকই নয় । তালাক যেহেতু সর্বশেষ উপায় তাই এই সিদ্ধান্ত অনেক ভেবে চিন্তে নিতে বলা হয়েছে । নবী (স) বলেছেন --

> *"অর্থাৎ তালাক জায়েজ হলেও দুনিয়ার সমস্ত জায়েজ কাজের মধ্যে এটি আল্লাহ্র কাছে সব চাইতে অপছন্দনীয় ।"* (১৩৬)

অর্থাৎ যেসমস্ত কাজ মানুষকে করার হুকুম দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য কাজ তালাক ।

নবী (স) আরো বলেছেন --

> *"বিয়ে করো এবং তালাক দিয়ো না । কারণ আল্লাহ্ এমন সব পুরুষ এবং নারীকে পছন্দ করেন না যারা ভ্রমরের মতো ফুলে ফুলে মধু আহরণ করে বেড়ায় ।"* (১৩৭)

ফলে বোঝাই যায় তালাক বা বিচ্ছেদ সহজ বিষয় নয় । সূরা বাকারায় তালাক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে । ২২৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে --

> *"তালাক প্রাপ্তাগণ তিনবার মাসিক ঋতুস্রাব হওয়া পর্যন্ত নিজেদেরকে বিরত রাখবে । আর আল্লাহ্ তাদের গর্ভাশয়ে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তাকে গোপন করা তাদের জন্য বৈধ নয় । তাদের কখনো এমনটি করা উচিত নয়, যদি তারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী হয়, তাদের স্বামীরা পুনরায় সম্পর্ক স্থাপনে প্রস্তুত হয়, তাহলে তারা এই অবকাশ কালের মধ্যে তাদেরকে নিজের স্ত্রী হিসেবে ফিরিয়ে নেবার অধিকারী হবে ।*
>
> *নারীদের জন্যও ঠিক তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন পুরুষদের অধিকার আছে তাদের ওপর । তবে পুরুষদের তাদের ওপর একটি মর্যদা আছে । আর সবার ওপরে আছেন আল্লাহ্ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী, বিচক্ষণ ও জ্ঞানী ।"* (১৩৮)

এই আয়াতই প্রমাণ করে নারীও এক্ষেত্রে পুরুষের মতো ক্ষমতা ভোগ করে, অর্থাৎ নারী নিজে নিজে তালাক নিতে পারে ।

আবার ২২৯ নম্বর আয়াতে এসেছে --

"তালাক দু'বার । তারপর সোজাসুজি স্ত্রীকে রেখে দিবে অথবা ভালভাবে বিদায় করে দেবে ।

আর তাদেরকে যা কিছু দিয়েছো বিদায় করার সময় তা থেকে কিছু ফিরিয়ে নেওয়া তোমার জন্য বৈধ নয় । তবে এটা স্বতন্ত্র, স্বামী-স্ত্রী যদি আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না বলে আশংকা করে, তাহলে এহেন অবস্থায় যদি তোমরা আশংকা করো, তারা উভয়েই আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থান করতে পারবে না, তাহলে স্ত্রীর কিছু বিনিময় দিয়ে তার স্বামী থেকে বিচ্ছেদ লাভ করায় কোন ক্ষতি নেই । এগুলো আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমারেখা, এগুলো অতিক্রম করো না । মূলত যারাই আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করবে তারাই জালেম ।" (১৩৯)

২৩০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে --

"অতপর যদি (দু'বার তালাক দেবার পর স্বামী তার স্ত্রীকে তৃতীয় বার) তালাক দেয়, তাহলে ঐ স্ত্রী তার জন্য আর হালাল হবে না । তবে যদি দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির সাথে তার বিয়ে হয় এবং সে তাকে তালাক দেয়, তাহলে এক্ষেত্রে প্রথম স্বামী এবং এই মহিলা আল্লাহ্র সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করতে পারবে বলে মনে করে তাহলে তাদের উভয়ের জন্য পরস্পরের দিকে ফিরে আসায় কোন ক্ষতি নেই । এগুলো আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমারেখা । (এগুলো ভঙ্গ করার পরিণতি) যারা জানে তাদের হিদায়াতের জন্য এগুলো সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন ।" (১৪০)

২৩১ নম্বর আয়াতে আছে --

"আর যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দাও এবং তাদের ইদ্দত পূর্ণ হবার পর্যায়ে পৌঁছে যায় তখন হয় তাদেরকে সোজাসুজি রেখে

দাও আর নয়তো ভালোভাবে বিদায় করে দাও । নিছক কষ্ট দেবার জন্য তাদেরকে আটকে রেখো না । কারণ এটা হবে বাড়াবাড়ি । আর যে ব্যক্তি এমনটি করবে সে আসলে নিজের ওপর জুলুম করবে । আল্লাহ্‌র আয়াতকে খেলা-তামাসায় পরিণত করো না । ভুলে যেয় না আল্লাহ্‌ তোমাদের কত বড় নিয়ামত দান করেছেন । তিনি তোমাদের উপদেশ দান করেছেন, যে কিতাব ও হিকমত তিনি তোমাদের ওপর নাজিল করেছেন তাকে মর্যদা দান করো । আল্লাহ্‌ কে ভয় করো এবং ভালোভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ্‌ সব কথা জানেন ।" (১৪১)

২৩২ আয়াতে বলা হয়েছে --

"তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের তালাক দেয়ার পর যখন তারা ইদ্দত পূর্ণ করে নেয় তখন তাদের নিজেদের প্রস্তাবিত স্বামীদের সাথে বিয়ের ব্যাপারে তোমরা বাধা দিয়ো না, যখন তারা প্রচলিত পদ্ধতিতে পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে সম্মত হয় । এ ধরণের পদক্ষেপ কখনো গ্রহণ না করার জন্য তোমাদের উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, যদি তোমরা আল্লাহ্‌ ও পরকালের প্রতি ইমান এনে থাকো । এ থেকে বিরত থাকাই তোমাদের জন্য সবচেয়ে পরিমার্জিত ও সর্বাধিক পবিত্র পদ্ধতি । আল্লাহ্‌ জানেন কিন্তু তোমরা জানো না ।" (১৪২)

২৩৩ আয়াতে আছে --

"যে পিতা তার সন্তানদের দুধ পানের সময়-কাল পূর্ণ করতে চায়, সে ক্ষেত্রে মায়েরা পুরো দু'বছর নিজেদের সন্তানদের দুধ পান করাবে । এ অবস্থায় সন্তানদের পিতাকে প্রচলিত পদ্ধতিতে মায়েদের খোরাক পোশাক দিতে হবে । কিন্তু কারোর ওপর তার সামর্থের বেশী বোঝা চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয় । কোন মা'কে এ

জন্য কষ্ট দেওয়া যাবে না, সন্তানটি তার । আবার কোন বাপকেও এ জন্য কষ্ট দেওয়া যাবে না যে, এটি তারই সন্তান ।" (১৪৩)

এবং ২৩৪ আয়াতে বলা হয়েছে --

"তোমাদের মধ্যে থেকে যারা মারা যায়, তাদের পরে যদি তাদের স্ত্রীরা জীবিত থাকে, তাহলে তাদের চার মাস দশ দিন নিজেদেরকে (বিবাহ থেকে) বিরত রাখতে হবে । তারপর তাদের ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেলে তারা ইচ্ছামতো নিজেদের ব্যাপারে প্রচলিত পদ্ধতিতে যা চায় করতে পারে, তোমাদের ওপর এর কোন দায়িত্ব নেই ।" (১৪৪)

সূরা বাকারার এই আয়াতের ব্যাখ্যা এবং হাদীস অনুযায়ী আমরা তালাকের উত্তম পদ্ধতি এইভাবে বলতে পারি --

১। স্বামী যেন কেবলমাত্র একবার তালাক দেয় । সে তার স্ত্রীকে বলবে, আমি তোমাকে তালাক দিলাম । তারপর সে যেন আর তালাক না দেয় । স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার জন্য ঐ একবার তালাকই যথেষ্ট ।

২। যে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হবে ঐ নারীটি তার মাসিক অসুখ থেকে পবিত্র হবার পর তার সাথে সঙ্গম না করে তার স্বামী যেন তাকে তালাক দেয় ।

৩। ঐ তালাক যেন দু'জন ভালো মানুষকে সাক্ষী রেখে দেওয়া হয় ।

৪। তালাক দেওয়ার পর স্ত্রীকে ইদ্দত পালন করতে হবে । অর্থাৎ মোটামুটি তিন মাস । কিন্তু ঐ তালাকপ্রাপ্ত যদি গর্ভবতী হয় তাহলে তার ইদ্দতকাল বাচ্চা প্রসব পর্যন্ত অর্থাৎ তিন মাসের বেশি হতে পারে ।

৫। কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দেবার পর উক্ত তিন মাসে বা ইদ্দতের মধ্যে চাইলে ঐ তালাকপ্রাপ্তাকে স্ত্রী হিসাবে ফেরত নিতে পারবে । ফেরত নেওয়ার সময় দু'জন ভালো মানুষের সামনে বলতে হবে যে, আমরা তালাক বাতিল করলাম । এবং এক্ষেত্রে বিয়ের কোনো প্রয়োজন নেই ।

৬। তবে স্বামী তার তালাক দেওয়া স্ত্রীকে ইদ্দতের এই তিন মাসের মধ্যে ফেরত না নিলে ইদ্দত পার হবার সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রী স্বামীর বিবাহ-বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে । এমতাবস্থায় ঐ নারীটি চাইলে অন্য পুরুষকে বিয়ে করতে পারবে । এতে কেউ বাধা দিতে পারবে না । এর বিপরীতে ঐ নারী এবং ওর তালাক দেওয়া স্বামী উভয়ে যদি পুনরায় স্বামী-স্ত্রী রূপে ঘর সংসার করতে চায় তাহলে উভয়ের মধ্যে পুনরায় বিয়ে দিতে হবে । কিন্তু এই পদ্ধতি মেনে একই স্বামী ও স্ত্রীর জীবনে যদি তিন বার তালাক হয়ে যায় তবে তারা চাইলেও আর স্বাভাবিকভাবে বিয়ে করতে পারবে না । তখন বিয়ে করতে হলে ঐ মহিলার স্বাভাবিকভাবে অন্যজনের সাথে বিয়ে হয়ে স্বাভাবিকভাবে যদি নিয়ম মেনে তালাক হয় তবেই পূর্বের স্বামীর সাথে সে আবার বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে । তবে পরিকল্পনা মাফিক যদি এই বিয়ে হয় তবে তা শুধু ভুল নয়, একেবারেই অসিদ্ধ । এই বিয়েকে 'হালালা বিয়ে' বলে ।

ফলে দেখা যাচ্ছে যে, পুরুষ-শাসিত সমাজের পুরুষরা ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যা ক্ষমতার জোরে নিজের মতো করে তৈরি করে অবাধে ইচ্ছেমতো একের পর এক বিয়ে করে এবং তালাক দেয় এবং তারা মনে করে সাথে তারা ধর্মের কাজও করছে । তারা নিজেদেরকে প্রচলিত গল্পের নায়ক ভাবে সুন্নত নামের একাজ করতে উঠে-পড়ে লাগে । যেমন নিসার আলী ('ফুলবউ'), গদু প্রধান, করিম বক্স ('সূর্যদীঘল বাড়ী'), এবং 'লালসালু'তে দোষ না থাকলেও মজিদ খালেক ব্যাপারীকে দিয়ে স্ত্রীকে তালাক দিতে বাধ্য করেছে । 'পদ্মরাগ'-এ জয়নব তালাক নিতে পারেনি, কারণ প্রচলিত প্রথানুযায়ী তালাক শুধুমাত্র পুরুষরাই দিতে পারে এবং ব্যারিষ্টার তার বউকে চিঠির মাধ্যমে তালাক দিয়েছে । 'অন্তঃপুরে' মইবু সামান্য কারণেই একসঙ্গে তিন বার তালাক দিয়েছে যা ধর্মগ্রন্থ বিরোধী । 'ধ্যানজোৎস্না'-য় স্বামী-স্ত্রী কেউ তালাক চায় কিনা কেউ জানতে চায়নি, বাবা-দাদারা জোর করে তালাক দিয়েছে । 'দ্বিতীয় বিবি'-তে সোভানের কার্যকলাপ ধর্ম বিরোধী । 'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখিত কিস্‌সা'তে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তালাক না হয়েও সমাজের কাছে তালাক হয়ে যায় । 'ঘুমকাতুরে ঈশ্বর'-এ যেভাবে নারীকে ব্যবহার করা হয়েছে তা স্বার্থলোভী মানুষের তৈরি নিয়ম । 'ঘুমকাতুরে ঈশ্বরে' নিয়ম না মেনে তালাক দিয়ে অন্যায়ভাবে হালালা বা

হল্লা বিয়ে দিয়ে নারীকে ভোগ করার সুবিধা নিয়েছে সমাজের ধান্দাবাজরা । ফলে দেখা যাচ্ছে, যে বিয়ে এবং তালাক মুসলিম সমাজে প্রচলিত তা অনেকাংশে ভুল । কিছু মানুষ নিজেদের সুবিধার জন্য ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা করে সমাজের মধ্যে চরম বিশৃঙ্খলা ঘটিয়েছে । বর্তমানেও এর জের সমাজে চলছে, মোবাইলে এস.এম.এস-এও তালাক হচ্ছে । রাগের মাথায় 'তালাক তালাক তালাক' বলে বউকে সঙ্গে সঙ্গে বার করে দিচ্ছে যা সম্পূর্ণ ধর্মগ্রন্থ বিরোধী । ২০১৬ সালের শুরুতে বেশ কয়েকটি সংগঠন প্রচলিত তিন তালাকের বিরুদ্ধে মামলা করেছে । এই মামলা ১৯৮৬ সালের সাহবানু মামলার কথা মনে করিয়ে দেয় । কিন্তু তালাক মুসলিমদের ধর্মীয় প্রথা বলে পাল্টা আন্দোলন এবং রাজনীতিও শুরু হয়েছে । এই রাজনীতি এবং পাল্টা রাজনীতিতে থমকে আছে কেসটি ।

উল্লেখ-সূত্র :

১। ভট্টাচার্য তপোধীর, 'নারী চেতনা : মননে ও সাহিত্যে', পুস্তক বিপণি, কলকাতা - ৯, প্রথম প্রকাশ – ২০০৭, পৃষ্ঠা – ২১-২২ ।

২। আজাদ হুমায়ুন, 'নারী', আগামী প্রকাশনী, ঢাকা – ১১১০, তৃতীয় সংস্করণ – ২০০০, পৃষ্ঠা – ৭০ ।

৩। রোকেয়া বেগম, 'পদ্মরাগ', 'রোকেয়া রচনা সংগ্রহ', বিশ্বকোষ পরিষদ, কলকাতা – ৬, দ্বিতীয় সংস্করণ – ২০০৬, পৃষ্ঠা – ২২৬ ।

৪। রোকেয়া বেগম, 'পদ্মরাগ', 'রোকেয়া রচনা সংগ্রহ', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ২২৬ ।

৫। রোকেয়া বেগম, 'পদ্মরাগ', 'রোকেয়া রচনা সংগ্রহ', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ২৭৬ ।

৬। রোকেয়া বেগম, 'পদ্মরাগ', 'রোকেয়া রচনা সংগ্রহ', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ২৭৬ ।

৭। রোকেয়া বেগম, 'পদ্মরাগ', 'রোকেয়া রচনা সংগ্রহ', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ২৯৭ ।

৮। রোকেয়া বেগম, 'পদ্মরাগ', 'রোকেয়া রচনা সংগ্রহ', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ২৯৮ ।

৯। রোকেয়া বেগম, 'পদ্মরাগ', 'রোকেয়া রচনা সংগ্রহ', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ২৪৫ ।

১০। রোকেয়া বেগম, 'পদ্মরাগ', 'রোকেয়া রচনা সংগ্রহ', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ২৫২ ।

১১। ওয়ালীউল্লাহ সৈয়দ, 'লালসালু', অ্যাডর্ন পাবলিকাশন, ঢাকা – ১০০০, প্রথম অ্যাডর্ন সংস্করণ – ২০১২, পৃষ্ঠা – ১৫ ।

১২। ওয়ালীউল্লাহ সৈয়দ, 'লালসালু', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ৫৮ ।

১৩। ওয়ালীউল্লাহ সৈয়দ, 'লালসালু', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ৬০ ।

১৪। পাল রবিন (সম্পাদনা), 'লালসালু : নানা প্রসঙ্গ', এবং মুশায়েরা, কলকাতা – ৭৩, প্রথম প্রকাশ – ২০১০, পৃষ্ঠা – ৬০ ।

১৫। ইসলাম শেখ মঈদুল, 'আত্মপরিচয়ের সংকট এবং বাংলা উপন্যাস', অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা – ৭৩, প্রথম প্রকাশ – ২০১৪, পৃষ্ঠা – ১১ ।

১৬। ইসহাক আবু, 'সূর্যদীঘল বাড়ী', চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা – ৭৩, চতুর্থ মুদ্রণ – ২০১২, পৃষ্ঠা – ১১ ।

১৭। ইসহাক আবু, 'সূর্যদীঘল বাড়ী', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ২৬ ।

১৮। ইসহাক আবু, 'সূর্যদীঘল বাড়ী', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ৯৮ ।

১৯। ভট্টাচার্য বীতশোক (সম্পাদনা), 'বাংলা উপন্যাস সমীক্ষা ২', এবং মুশায়েরা, কলকাতা – ৭৩, প্রথম প্রকাশ – ২০০৮, পৃষ্ঠা – ৪৬ ।

২০। ইসহাক আবু, 'সূর্যদীঘল বাড়ী', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ১১২ ।

২১। খাতুন আফরোজা, 'বাংলা কথাসাহিত্যে মুসলিম অন্তঃপুর', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা – ৭৩, প্রথম প্রকাশ – ২০১১, পৃষ্ঠা – ১৪৩ ।

২২। কায়সার শহীদুল্লা, 'সংশপ্তক', চারুলিপি প্রকাশন, ঢাকা – ১১০০, তৃতীয় সংস্করণ – ২০১৬, পৃষ্ঠা – ১৫১ ।

২৩। কায়সার শহীদুল্লা, 'সংশপ্তক', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ১৫২ ।

২৪। কায়সার শহীদুল্লা, 'সংশপ্তক', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ১৬২ ।

২৫। কায়সার শহীদুল্লা, 'সংশপ্তক', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ১৫৮-১৫৯ ।

২৬। কায়সার শহীদুল্লা, 'সংশপ্তক', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ১৫৯ ।

২৭। ভৌমিক তাপস (সম্পাদক), 'কোরক সাহিত্য পত্রিকা', প্রাক্ শারদ সংখ্যা-১৪১৫, কলকাতা – ৫৯, পৃষ্ঠা – ৫০ ।

২৮। Singha Manindra Nath, 'A Golden book of English Poem' Shree Dhar Prakashani, Kolkata – 6, 5th Edition – 2007, Page – 23.

২৯। ভৌমিক তাপস (সম্পাদক), 'কোরক সাহিত্য পত্রিকা', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ৪৮ ।

৩০। ভৌমিক তাপস (সম্পাদক), 'কোরক সাহিত্য পত্রিকা', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ৪৫ ।

৩১। ভৌমিক তাপস (সম্পাদক), 'কোরক সাহিত্য পত্রিকা', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ৪৬ ।

৩২। ভৌমিক তাপস (সম্পাদক), 'কোরক সাহিত্য পত্রিকা', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ৪৬ ।

৩৩। ভৌমিক তাপস (সম্পাদক), 'কোরক সাহিত্য পত্রিকা', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ৪৭ ।

৩৪। ভৌমিক তাপস (সম্পাদক), 'কোরক সাহিত্য পত্রিকা', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ৪৭ ।

৩৫। বাশার আবুল, 'ফুলবউ', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা – ৯, দশম মুদ্রণ – ২০১৩, পৃষ্ঠা – ১০ ।

৩৬। বাশার আবুল, 'ফুলবউ', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ২১ ।

৩৭। বাশার আবুল, 'ফুলবউ', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ২১-২২ ।

৩৮। বাশার আবুল, 'ফুলবউ', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ৩৫ ।

৩৯। বাশার আবুল, 'ফুলবউ', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ৩৬-৩৭ ।

৪০। বাশার আবুল, 'ফুলবউ', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ৩৭ ।

৪১। বাশার আবুল, 'ফুলবউ', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ৩৭ ।

৪২। বাশার আবুল, 'ফুলবউ', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ৩৭ ।

৪৩। বাশার আবুল, 'ফুলবউ', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ৩৮ ।

৪৪। বাশার আবুল, 'ফুলবউ', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ৩৮ ।

৪৫। বাশার আবুল, 'ফুলবউ', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ২৭ ।

৪৬। বাশার আবুল, 'ফুলবউ', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ২৭ ।

৪৭। বাশার আবুল, 'ফুলবউ', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ১২০ ।

৪৮। বাশার আবুল, 'ফুলবউ', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ১৫৮ ।

৪৯। খাতুন আফরোজা, 'বাংলা কথাসাহিত্যে মুসলিম অন্তঃপুর', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ১০১ ।

৫০। বাশার আবুল, 'ধর্মের গ্রহণ', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা – ৯, তৃতীয় মুদ্রণ – ২০০০, প্রচ্ছদ ।

৫১। বাশার আবুল, 'ধর্মের গ্রহণ', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ৬২ ।

৫২। বাশার আবুল, 'ধর্মের গ্রহণ', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ৬২-৬৩ ।

৫৩। বাশার আবুল, 'ধর্মের গ্রহণ', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ৬৯-৭০ ।

৫৪। খাতুন আফরোজা, 'বাংলা কথাসাহিত্যে মুসলিম অন্তঃপুর', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ১১০ ।

৫৫। বাশার আবুল, 'ধর্মের গ্রহণ', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ১০৯ ।

৫৬। বাশার আবুল, 'ধর্মের গ্রহণ', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ১১৪-১১৫ ।

৫৭। বাশার আবুল, 'ধর্মের গ্রহণ', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ১৩৫ ।

৫৮। বাশার আবুল, 'ধর্মের গ্রহণ', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ১৪১ ।

৫৯। বাশার আবুল, 'ধর্মের গ্রহণ', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ১৪১ ।

৬০। বাশার আবুল, 'ধর্মের গ্রহণ', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ১৪২ ।

৬১। বাশার আবুল, 'ধর্মের গ্রহণ', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ১৪৪ ।

৬২। বাশার আবুল, 'ধর্মের গ্রহণ', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ১৪৫ ।

৬৩। বাশার আবুল, 'ধর্মের গ্রহণ', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ১৪৪ ।

৬৪। বাশার আবুল, 'ধর্মের গ্রহণ', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ১৪৫ ।

৬৫। খাতুন আফরোজা, 'বাংলা কথাসাহিত্যে মুসলিম অন্তঃপুর', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ১১১-১১২ ।

৬৬। ভৌমিক তাপস (সম্পাদক), 'কোরক সাহিত্য পত্রিকা', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ৫১ ।

৬৭। বাশার আবুল, 'ধর্মের গ্রহণ', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ১৫৪ ।

৬৮। বাশার আবুল, 'ধর্মের গ্রহণ', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ১৫৬ ।

৬৯। বাশার আবুল, 'ধর্মের গ্রহণ', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ১৫৮ ।

৭০। বাশার আবুল, 'ধর্মের গ্রহণ', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ১৬৬ ।

৭১। বাশার আবুল, 'ধর্মের গ্রহণ', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ১৬৬ ।

৭২। বাশার আবুল, 'ধর্মের গ্রহণ', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ১৮০ ।

৭৩। আমেদ আফসার, 'অন্তঃপুর', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা – ৭৩, প্রথম প্রকাশ - ১৯৯৩, পৃষ্ঠা – ২৮ ।

৭৪। আমেদ আফসার, 'অন্তঃপুর', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ২১ ।

৭৫। আমেদ আফসার, 'অন্তঃপুর', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ১৩৯ ।

৭৬। আমেদ আফসার, 'অন্তঃপুর', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ১৪৫ ।

৭৭। আমেদ আফসার, 'অন্তঃপুর', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ১৪৩ ।

৭৮। আমেদ আফসার, 'অন্তঃপুর', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ১৮৪ ।

৭৯। আমেদ আফসার, 'অন্তঃপুর', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ১৯২ ।

৮০। আমেদ আফসার, 'অন্তঃপুর', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ১৯২ ।

৮১। আমেদ আফসার, 'অন্তঃপুর', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ১৯২ ।

৮২। আমেদ আফসার, 'অন্তঃপুর', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ১৯২ ।

৮৩। আমেদ আফসার, 'অন্তঃপুর', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ১৯৩ ।

৮৪। আমেদ আফসার, 'ধানজোৎস্না', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা – ৭৩, প্রথম প্রকাশ - ২০০৩, পৃষ্ঠা – ৩২-৩৩ ।

৮৫। আমেদ আফসার, 'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা', 'কিস্‌সা সমগ্র-১', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা – ৭৩, প্রথম প্রকাশ – ২০১৬, পৃষ্ঠা – ৪৫ ।

৮৬। আমেদ আফসার, 'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা', 'কিস্‌সা সমগ্র-১', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ৪৫-৪৬ ।

৮৭। আমেদ আফসার, 'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা', 'কিস্‌সা সমগ্র-১', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ৪৬ ।

৮৮। আমেদ আফসার, 'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা', 'কিস্‌সা সমগ্র-১', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ৮৬ ।

৮৯। আমেদ আফসার, 'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা', 'কিস্‌সা সমগ্র-১', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ৫২ ।

৯০। আমেদ আফসার, 'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা', 'কিস্‌সা সমগ্র-১', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ৫০ ।

৯১। আমেদ আফসার, 'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা', 'কিস্‌সা সমগ্র-১', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ৪৭ ।

৯২। আমেদ আফসার, 'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা', 'কিস্‌সা সমগ্র-১', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ৫২ ।

৯৩। খাতুন আফরোজা, 'বাংলা কথাসাহিত্যে মুসলিম অন্তঃপুর', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ১২২ ।

৯৪। খাতুন আফরোজা, 'বাংলা কথাসাহিত্যে মুসলিম অন্তঃপুর', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ১২১ ।

৯৫। আমেদ আফসার, 'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা', 'কিস্‌সা সমগ্র-১', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ৮২ ।

৯৬। আমেদ আফসার, 'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা', 'কিস্‌সা সমগ্র-১', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ৮২ ।

৯৭। আমেদ আফসার, 'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা', 'কিস্‌সা সমগ্র-১', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ৮২ ।

৯৮। আমেদ আফসার, 'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা', 'কিস্‌সা সমগ্র-১', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ৮৬ ।

৯৯। খাতুন আফরোজা, 'বাংলা কথাসাহিত্যে মুসলিম অন্তঃপুর', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ১২২ ।

১০০। আমেদ আফসার, 'দ্বিতীয় বিবি', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা – ৭৩, প্রথম প্রকাশ - ১৯৯৭, পৃষ্ঠা – ১৫-১৬ ।

১০১। আমেদ আফসার, 'দ্বিতীয় বিবি', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ২০ ।

১০২। আমেদ আফসার, 'দ্বিতীয় বিবি', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ৩০ ।

১০৩। আমেদ আফসার, 'দ্বিতীয় বিবি', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ৩৫ ।

১০৪। আমেদ আফসার, 'দ্বিতীয় বিবি', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ৩৯ ।

১০৫। আমেদ আফসার, 'দ্বিতীয় বিবি', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ৪৯ ।

১০৬। আমেদ আফসার, 'দ্বিতীয় বিবি', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ৪৯ ।

১০৭। আমেদ আফসার, 'দ্বিতীয় বিবি', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ৪৯ ।

১০৮। আমেদ আফসার, 'দ্বিতীয় বিবি', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ৫১ ।

১০৯। আমেদ আফসার, 'দ্বিতীয় বিবি', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ৫১ ।

১১০। আমেদ আফসার, 'দ্বিতীয় বিবি', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ৮৭ ।

১১১। আমেদ আফসার, 'দ্বিতীয় বিবি', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ৬৭ ।

১১২। আমেদ আফসার, 'দ্বিতীয় বিবি', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ১০৩-১০৪ ।

১১৩। হোসেন সেলিনা, 'ঘুমকাতুরে ঈশ্বর', মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা – ১১০০, প্রথম প্রকাশ – ২০০৪, পৃষ্ঠা – ১১৭ ।

১১৪। হোসেন সেলিনা, 'ঘুমকাতুরে ঈশ্বর', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ১০৭ ।

১১৫। হোসেন সেলিনা, 'ঘুমকাতুরে ঈশ্বর', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ১০৭ ।

১১৬। হোসেন সেলিনা, 'ঘুমকাতুরে ঈশ্বর', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ১২৩ ।

১১৭। হোসেন সেলিনা, 'ঘুমকাতুরে ঈশ্বর', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ১৩৪ ।

১১৮। হোসেন সেলিনা, 'ঘুমকাতুরে ঈশ্বর', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ১৩৩ ।

১১৯। হোসেন সেলিনা, 'ঘুমকাতুরে ঈশ্বর', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ১৩৩ ।

১২০। হোসেন সেলিনা, 'ঘুমকাতুরে ঈশ্বর', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ১৩৪ ।

১২১। হোসেন সেলিনা, 'ঘুমকাতুরে ঈশ্বর', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ১৩৪ ।

১২২। হোসেন সেলিনা, 'ঘুমকাতুরে ঈশ্বর', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ১৩৫ ।

১২৩। হোসেন সেলিনা, 'ঘুমকাতুরে ঈশ্বর', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ১৩৭ ।

১২৪। হোসেন সেলিনা, 'ঘুমকাতুরে ঈশ্বর', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ১৪৩ ।

১২৫। আহমেদ শামিম, 'বিষাদবিন্দু', অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা – ৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ – ২০১৪, প্রচ্ছদ ।

১২৬। আহমেদ শামিম, 'বিষাদবিন্দু', অনুরূপ, কথামুখ ।

১২৭। আহমেদ শামিম, 'বিষাদবিন্দু', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ১২ ।

১২৮। আহমেদ শামিম, 'বিষাদবিন্দু', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ২৩-২৪ ।

১২৯। আহমেদ শামিম, 'বিষাদবিন্দু', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ২৬ ।

১৩০। আহমেদ শামিম, 'বিষাদবিন্দু', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ২৫ ।

১৩১। আহমেদ শামিম, 'বিষাদবিন্দু', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ৪২-৪৩ ।

১৩২। আহমেদ শামিম, 'বিষাদবিন্দু', অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ৪৩-৪৪ ।

১৩৩। মওদূদী সাইয়েদ আবুল আ'লা (অনুবাদ : আবদুল মান্নান তালিব), 'তাফহীমুল কুরআন', প্রথম খণ্ড, বাংলা ইসলামিক প্রকাশনী ট্রাষ্ট, কলকাতা – ১৩, ষষ্ঠ প্রকাশ ২০১৪, পৃষ্ঠা – ৩৩৯ ।

১৩৪। মওদূদী সাইয়েদ আবুল আ'লা (অনুবাদ : আবদুল মান্নান তালিব), 'তাফহীমুল কুরআন', প্রথম খণ্ড, অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ৪৩০ ।

১৩৫। মওদূদী সাইয়েদ আবুল আ'লা (অনুবাদ : আবদুল মান্নান তালিব), 'তাফহীমুল কুরআন', প্রথম খণ্ড, অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ৩৫৩ ।

১৩৬। মওদূদী সাইয়েদ আবুল আ'লা (অনুবাদ : আবদুল মান্নান তালিব), 'তাফহীমুল কুরআন', প্রথম খণ্ড, অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ৩৫৪ ।

১৩৭। মওদূদী সাইয়েদ আবুল আ'লা (অনুবাদ : আবদুল মান্নান তালিব), 'তাফহীমুল কুরআন', প্রথম খণ্ড, অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ৩৫৫ ।

১৩৮। মওদূদী সাইয়েদ আবুল আ'লা (অনুবাদ : আবদুল মান্নান তালিব), 'তাফহীমুল কুরআন', প্রথম খণ্ড, অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ১৮৬ ।

১৩৯। মওদূদী সাইয়েদ আবুল আ'লা (অনুবাদ : আবদুল মান্নান তালিব), 'তাফহীমুল কুরআন', প্রথম খণ্ড, অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ১৮৭ ।

১৪০। মওদূদী সাইয়েদ আবুল আ'লা (অনুবাদ : আবদুল মান্নান তালিব), 'তাফহীমুল কুরআন', প্রথম খণ্ড, অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ১৮৯ ।

১৪১। মওদূদী সাইয়েদ আবুল আ'লা (অনুবাদ : আবদুল মান্নান তালিব), 'তাফহীমুল কুরআন', প্রথম খণ্ড, অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ১৯০ ।

১৪২। মওদূদী সাইয়েদ আবুল আ'লা (অনুবাদ : আবদুল মান্নান তালিব), 'তাফহীমুল কুরআন', প্রথম খণ্ড, অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ১৯১ ।

১৪৩। মওদূদী সাইয়েদ আবুল আ'লা (অনুবাদ : আবদুল মান্নান তালিব), 'তাফহীমুল কুরআন', প্রথম খণ্ড, অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ১৯২ ।

১৪৪। মওদূদী সাইয়েদ আবুল আ'লা (অনুবাদ : আবদুল মান্নান তালিব), 'তাফহীমুল কুরআন', প্রথম খণ্ড, অনুরূপ, পৃষ্ঠা – ১৯৩ ।